KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৩/2 এ, স্বীকৃতি (সরল সরণী, কল-৬ (প্রতিবেদী সরণীর (দক্ষিণ) এ-20, (দ্বারভাঙ্গা সংরক্ষণ আবাসন, পুরানো কলোনী, কল-৫২)
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title :	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 4/1-2 5/1 18/2	Year of Publication : Aug-Nov 1984 Aug 1985 (99) Dec - Feb 2000
	Condition : Brittle Good
Editor : [illegible]	Remarks :

CD Rod No : KLMLGK

অ

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঠিকানা ঃ এ-২৩, নেতাজী সমবায় আবাস,
প্রফুল্ল কানন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯
দূরভাষ ও দূরবার্তা ঃ ০৩৩-৫৪৯ ৬১৫৪

ঃ অ প্রতিনিধি ঃ

দিল্লী ঃ অলোকরঞ্জন বিশ্বাস
সি-৩৮, সরিতা বিহার
নতুন দিল্লী - ১১০০৪৪
দূরভাষ ঃ ০১১-৬৯৫ ৫৯১০

কাঁথি	ঃ	সুব্রত গুহ
বালুরঘাট	ঃ	মৃন্ময়ী তোকদার
ডায়মন্ডহারবার	ঃ	সাধনা মন্ডল
মেদিনীপুর	ঃ	ঈশিতা মন্ডল
মস্কো	ঃ	বিশ্বরূপ সান্যাল
ওসলো	ঃ	আরিল্ড এঙ্গেলসেন রুল্ড
ঢাকা	ঃ	সৈয়দ আলী ইমাম

ঃ সহায়তা ঃ

রেশমী চট্টোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর মিত্র, বিশ্বজিৎ সরকার, অসিত সমাদ্দার, সুধাজিৎ গুহ, সঞ্জয় দত্ত

ঃ মুদ্রণ ঃ

সোনার বাংলা এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
কলকাতা - ৭০০ ০৫৯

ঃ প্রকাশনায় ঃ

স্কাড
এ-২৩, নেতাজী সমবায় আবাস,
প্রফুল্ল কানন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯

ঃ সম্পাদক ঃ

শতরূপা সান্যাল

অ-ডিসেম্বর, ১৯৯৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

যখন 'অ' তার নবপর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় পা রাখছে, ঠিক সেই সময়ে সারা দুনিয়া জুড়ে সাজো সাজো রব উঠেছে - শুরু হতে চলেছে নতুন এক শতক, নতুন সহস্রাব্দ! খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে এই ঘটনাটি সাড়া জাগাবেই। সচেতন মানুষ মাত্রেই বসে যাবেন গত শতকে কি পেলাম আর কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে। আমরা মনে করি নিতান্ত বস্তুগত প্রাপ্তির চেয়েও বড় প্রাপ্তি গত শতকের অভিজ্ঞতার ভান্ডার। মানুষ তথা পৃথিবী ক্রমশ আত্মবিনাশের দিকে যাবে নাকি আত্মশুদ্ধির যজ্ঞের আয়োজন করবে, সেটাই ভাবার। যুদ্ধ, মহামারী, দারিদ্র, দুঃখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা এ সব কিছুই যে জায়গাটার দিকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তা হল লোভ, অপরিসীম লোভ। এই লোভের কারণেই মানুষ অন্ধ। কোথাও ক্ষমতার লোভ, কোথাও বাজার দখলের লোভ, - কোথাও প্রকৃতিকে লুঠ করার লোভ। পৃথিবীর নানা দেশের সব ভৌগোলিক সীমানা ছাপিয়ে গেছে এই ব্যাধি। ভাবার আছে বই কি! আমরা আমাদের উত্তরপ্রজন্মকে কি দিয়ে যাব সেটার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি এই ভাবনা যে - উত্তরপ্রজন্ম আদৌ থাকবে কি?

শুধু শান্তির ললিত বাণী নয়, দেশে দেশে সচেতন মানুষ এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সেটাই আশার। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার ও সচেতন হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা এই নতুন বছরে আরো দৃঢ়তর হবে তা আমরা বিশ্বাস করি। যে প্রবল পরাক্রান্ত বাঁধটি আমাদের গড়তে হবে ধ্বংসের মোকাবিলায়, তার একটি একটি ইঁট - পাথর নিয়ে আসছেন শিল্পী, কর্মী, বুদ্ধিজীবীসহ আমাদের মত অজস্র লিট্‌ল ম্যাগাজিন। তা প্রথা সম্মত হোক বা না হোক। আমরা এক যুদ্ধহীন, শান্তিপূর্ণ, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের যুগে প্রবেশ করতে চাই।

শতরূপা সান্যাল
সম্পাদক 'অ'

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ১৮ বর্ষ নবপর্যায় দ্বিতীয় সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৯

সম্পাদক ঃ শতরূপা সান্যাল

কার্যনির্বাহী সম্পাদক মন্ডলী ঃ

ইমানুল হক, সোনালী পাল ও মহাশ্বেতা সান্যাল।

		পৃষ্ঠা
ধ্রুপদী		
ভার্জিল ও হোমারের রচনা থেকে	অনুবাদ ঃ তরুণ সান্যাল	৩
প্রবন্ধ		
একুশে ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	মিলন গাইন	৭
ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার	আবুবকর সিদ্দিক	১৩
জাতের নামে বজ্জাতি	দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
দায়বদ্ধতার দায়	আয়েশা খাতুন	৪৫
বীরভূমের পোড়ামাটির ইতিহাস	নীতা সেনগুপ্ত	৫২
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	মুহাম্মদ ইউনূস	৫৪
কবিতা		
অনুবাদ কবিতা	সুগতাকুমারী (মালয়ালম বি. টি. ললিতা নায়ক (কন্নড়) ই. পার্বতী (তেলুগু) সংস্কৃতি রাণী দেশাই (গুজরাতি)	৬৭-৭১
কবিতা গুচ্ছ	শুভঙ্কর ঘোষ, বিপুল চক্রবর্তী, তিস্তা মিত্র, বিমল দেব, দিলীপ সামন্ত, অনুপ ঘোষাল, নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শতরূপা সান্যাল	৭২-৭৯
গল্প		
এত সুখ সইবে না	ইমানুল হক	৮০
আশ্রম কন্যা	রীণা চক্রবর্তী	৮৪
অনুরণন	রুমা পাল	৮৮
সাক্ষাৎকার (গৌতম ঘোষের সাক্ষাৎকার)		৯৯
স্মরণ		
বেগম সুফিয়া কামাল	তরুণ সান্যাল	১০৮
সুফিয়া কামালের দুটি কবিতা		১১২
সংস্কৃতি সংবাদ	সংবা.	১১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ধ্রুপদী

ঈনিডের পঞ্চম পুস্তক থেকে

পলিনুরাসের ঘুম

ভার্জিল

... চোখ না তুলেই পলিনুরাস জবাব দিলো তার,
'সমুদ্রের শান্ত মুখ দিগ্‌দিগন্ত তরঙ্গে বিস্তার
বিশ্বাস কোরো না। সেতো এই নিবাত, এই ঝোড়ো তুফান
সমুদ্র দানব নেয় কী রূপ তা অজানা ব্যাখ্যান।
ইনিয়াসকে বোঝাতে হবে মন্দ মন্দ হাওয়ার চালাকি .
পিছে আছে ঝড়ঝঞ্ঝা সামনে নিস্তরঙ্গতার ফাঁকি।
বিশ্বাস করেছি কতো সমুদ্রে ঢেউয়ের শান্ত নাচে
নির্মেঘ বিশাল নীল যেন জলে গুলে মিশে আছে।"
সে বজ্রবাহুর ঘেরে এই বলে চেপে ধরলো হাল
দুল নক্ষত্রের দিকে ভারি চোখ, কিছুটা বেতাল,
বৈতরণী থেকে দেবতা ডাল এনে চামর দোলায়
সে শিশির সিক্ত হাওয়া বিস্মরণে অস্তিত্ব ভোলায়,
ঢেউ ভাঙছিল ভ্রূ-পাটায় ঢেউ ভাঙছিল মুদে আসা চোখে
এক পা এক পা ঘুম এগোয়, ঢাকছে স্নায়ু ঘুমের নির্মোকে।
আলস্যে কেমন যেন ভারি হয়ে উঠলো কেডুয়াল
দড়িদড়া ছিঁড়ে জলে পড়লো, হাতে ছিটকে গেল হাল,
গোলই উহর পাল কাছি ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেললো জলে
সেই ঘুম অগাধ ঘুম ভাসিয়ে দিলো ছল ছল কল্লোলে।
'বাঁচাও বাঁচাও' বলে পলিনুরাস যতই দেয় হাঁক
ঘুমে কাদা নাবিকেরা, চোখ ছুঁয়েছে ঘুম-পরীর পাখ।
হোক তা প্রথম যাত্রা, জলযান হোক ভাসমান,
দেবতা নেপচুন তাও টেনে নেন, যদি তিনি চান।
সাইরেন পাহাড়ে ভেসে যায় জাহাজ ঘুম ঘুম মাতাল
খাঁড়িতে যেখানে জমা কত কত জাহাজী কঙ্কাল।
হালে কোনো মাঝি নেই জাহাজ চলেছে কোনখানে
নেপচুনের চোখে জল নিশি পাওয়া জাহাজের টানে!
পলিনুরাস পাড়ি দিয়েছিস এসব সমুদ্র কতবার
শুকোবে সৈকতে কিন্তু তোর এবার শুকনো সাদা হাড়।

বঙ্গানুবাদ ঃ তরুণ সান্যাল

ইলিয়াদের ষোড়শ কান্ড থেকে

রণক্ষেত্রে সমাবেত যুযুৎসব

হোমার

ইস্পাতের নীলে এসে বসেছে বাতাস
দিনের আলোও যেন ঘন হয়ে মেঘে ফাঁক ফোঁকরে
নেমে এসেছে শিভার শঙ্কুতে
রোদ্দুরের একটি দীর্ঘ রেখা যেন ফাঁস ঝুলে রয়েছে,
শার্পেদনের শব শুইয়ে রেখে রোদ জমাট তিনকোনা জমিনে
জলদচি তীব্রতা তখন শঙ্কু পথে
দু - হাত দু' পাশে ছড়ানো মোম - মোম শরীর যেন দেবতা ঘুমাচ্ছে
রক্ত তার গড়িয়ে যাচ্ছে
হায়াসিন্থ বালি জমাট পিছল শ্যাওলায়
তখন গ্লোকাস বললো
কত সহ্যেই তুমি বন্ধুদের ভুলেছ, হেকতর?
ওরা রক্তে মাখামাখি আর তুমি রোদ খাওয়াচ্ছ হাঁটু
তোমার ভ্রুক্ষেপও নেই -

ওরা মরছে গা থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বিদেশিরা বর্ম-সাজপোশাক
বন্ধুদের লাশ ওরা বিকৃত করছে,
আমাদের শহীদদের হেনস্থা করছে,
তুমি হুঁশিয়ার, তাই আমাদের মৃতদের এত অপমান
আর কত সহ্যেই..... অবহেলায় - গুওরমাথা কশাই দেবতাটি
গ্রীক ব্রোঞ্জ বল্লমে খুঁচিয়ে আমাদের ঢের জনাকে পেড়ে ফেলেছে,
শার্পেদনও মারা পড়ল, হায়রে হেকতর।
একিলিসের তরুণ বন্ধুটি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করলো
আর তুমি কিচ্ছুটি করলে না,
কদিন আগেই তুমি শার্পেদনের মদত চেয়েছো।
বলেছিলে 'বাধিত হব'
সে যখন কথা দিল বলেছিলে 'ধন্যবাদ ধন্যবাদ'
অর্ধেক লিসিয়া সঙ্গে এনে কথা রেখেছে সে,
যে দিন সে টুয়ে এলো
তোমার বাবাও কত কত ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা তোমার ধন্যবাদের সঙ্গে
জুড়ে দিলেন, আর

শার্পেদন বর্ম যোদ্ধবেশ পড়ে
নিজের বাহিনী নিয়ে গ্রীকদের সঙ্গে যুঝতে শুরু করলো,
সে দিনতো বটেই পরপর প্রতিটি দিনই দীর্ঘবেলার রণক্ষেত্রে লড়ে যেতো
সে শিবির থেকে বেরোত প্রথম, ফিরতো সবশেষে হাসতে হাসতে
সারা দেহে সোনা রঙা ক্ষতচিহ্ন চমৎকার সভা ভব্য কথা-বার্তা,
বোঝা যেত সে সবারই মাথা,
আজকেও সে সবার আগে পার হলো অ্যাগামেমননের পরিখা,
এখন সে লাশ মাত্র, সে এখন একা পড়ে আছে
কেউ সঙ্গে নেই
সে রক্তঋণ শোধ করবে কি করে হেকতর?

তখন ট্রোওজানরা সবাই রণক্ষেত্রে চলে গেছে,
মস্ত সমান মাঠ ওরা যেন চাকায় গড়িয়ে চলে গেলো
হাঁটু মুড়ে বসা ধানুকীর তীরের ফলার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে,
হেকতর তখন ঘোড়ার উপর ঝুঁকে, পেটে বাঁধা রথের রশিতে টান দিলো
যেন ঘোড়া নয় ঘুরন্ত চোখের দৃষ্টি এক টানে নিয়ে ফেললো ট্রোজানদের রণভূমিতে।
ঝাঁপিয়ে পড়লো টগবগ ঘূর্ণিতে। যুদ্ধ।
ধুলো তখন রাঙা কুয়াশা। যন্ত্রণাও শ্লেটে চক্ খড়ি।
শরীরে উত্তাপ তখন ঠান্ডা মেরে গেছে
শার্পেদনের শরীর থেকে জীবনের আভা গেছে মিলিয়ে।
শত্রুরা রয়েছে তার লাশ ঘিরে। ব্রোঞ্জ ফুলকি চতুর্দিকে
মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ। ছেঁড়া পতাকার পিছে দৌড়ে আসে নতুন পতাকা।
ছেঁড়াখোড়া সোনালি কেতন ঢেকে দিলো নীল নীল নিশান
নীল পতাকা ঠেলে দিচ্ছে সোনালি পতাকা
দু নিশানই ছিন্নভিন্ন
শরজাল মৌমাছির ঝাঁক যেন, শরতের বৃষ্টির চেয়েও ঘন,
বাঁয়ের ঘোড়াটি মরলো। ডাইনের ঘোড়াটি তখন ঢুকে গেল ছোরার জঙ্গলে
রেশমি বেলুনের মতো তার পেট ফেঁসে গেল,
তীরের প্লাবন ঠেলে ঠেলে এক পা এক পা এগোচ্ছে ঢাল
আর সে ঢালের তলে প্রায় পথ হারানো সৈন্যরাও যেন ভাবছে;
"যুদ্ধ শুরু সূর্য উঠলে, সূর্য ডুবলে শুনতে থাকি ক'জনা খতম।
আমাদের হেলেনের রূপে কি আসে বা যায়"
অর্ধেক ফৌজ খতম, গেরুয়া কুয়াশা ধুলো ঘিরে রেখেছে হাঁটু
ওরা সামনে ঠেলে উঠতে চায়, কোথায় কি ঘটছে কোনও জ্ঞানচেতনা নাই,
যতক্ষণ না ঢালে ঢালে ঠোকাঠুকি টক্কর বাজায়

--ই।
কালো অর্ধবৃত্ত সেই আট হাত খাড়াই খাতে ধাক্কা ধাক্কি
— ঐ।

আর সেই আধা আলোয় ঢুকে পড়লে যে প্রথম ইতস্তত করে
বা একটু দোদুলমান হয়, বাস তার হয়ে গেছে!.....
তারা যখনি পিছু হটতে চায়, তখনি বল্লমে বল্লমে ফলা জ্বলে ওঠে
কালো ঢালে চামড়ার ফাঁক ফোঁকরে,
ব্রোঞ্জ জ্বলে উঠছে ইতিউতি, পাঁজরের হাড়
সার দিয়ে দাঁড়ায় যেন ঢোলের গোলাপি ঘের কাঠ।
আর সবার উপরে
পিপড়ে ধরা রক্তধার যেমনটি মাছির ভিড়ে থিক-থিক
তেমনি দলপতিরাও লোহার গালপাট্টা বেঁধে
এ ওকে ছাড়িয়ে ভেসে যায় হাঁকাহাঁকিতে
আলো জমাট হয়ে রয়েছে বুকে বাঁধা ধাতুপট্টে,
এত রক্ত মাখামাখি কে যে শত্রু কে যে মিত্র কে কাকে যে সাথী ভাবছে
একটু ফিরে না দেখে ও সেলাম দিচ্ছে না,
অথবা সেলাম দিচ্ছে শত্রুদেরই,
কিন্তু যারা পা মিলিয়ে রয়েছি তারা জানছি ঐ,
আমাদের শত্রু আসছে ব্যূহের মাথায়।
তবু আমরা কুচকাওয়াজ করে এগোই।
যাদের হুকুম শুনছি সে সব গলার স্বর শত্রুদেরই, তবু শুনছি!
যে মানুষটি সব সময়ে দুষমনের কথা শোনাচ্ছে, সে ব্যক্তিটি নিজেই দুষমন!
বালিয়াড়ির ওপরে আলো ঘুরে যাচ্ছে। কেমন উত্তপ্ত শাদা।
আর সেই যুযুধান দু পক্ষের ঢের উপরে আকাশে উড়াল লার্ক পাখি,
মেঘ ছিড়ে উড়ে যাচ্ছে শ্বাস নিচ্ছে বিভ্রমে ধোঁয়ায়।

বঙ্গীকরণ ঃ তরুণ সান্যাল

একুশে ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

মিলন গাইন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৪৭: বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতির পরিণতিতে স্বাধীনোত্তর পর্বে আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়— সে ইতিহাস আমাদের জানা। দ্বিজাতি তত্ত্বের 'বিষাক্ত তত্ত্ব' সেদিন হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতর বিস্তর ব্যবধান বাড়াতে সুচতুর ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়গত অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসকে সুকৌশলে সঞ্চারিত করতে পেরেছিল আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতায়—তার কুফল আমরা ভারতবাসী আজও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সম্প্রদায়গত ভাগাভাগিতে পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে কেউবা পাকিস্তান আর কেউ বা হিন্দুস্থান সাত-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন সাতচল্লিশের সেই ঐতিহাসিক দুঃসময়ে। সেই দুঃসময় এখনও ছাড়েনি তাঁদের যাঁরা আজ পাকিস্তানে মোহাজির অথবা ভারতে রিফিউজি বা উদ্বাস্তু; ক্যাম্প আর কলোনিতে যাঁদের আজও জীবন মরণ!

একুশের পটভূমি ঃ

ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার ফলে বঙ্গদেশ খণ্ডিত হয়ে পরিচিতি পেল পূর্ব পাকিস্তান আর ভারতের পশ্চিমবাংলা। পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ হিন্দুদের থেকে জনসংখ্যায় হিসাবে বেশি থাকায় পূর্ববঙ্গ হলো পূর্বপাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক কোলাহলে সেই সময় হিন্দু ও মুসলমান অনেকেই গেলেন পূর্বপাকিস্তানে আবার সেখান থেকে কেউ কেউ এলেন পশ্চিমবাংলায়। মাতৃভূমিকে চিরতরে ছেড়ে না যাওয়ার কঠিন পরীক্ষায় রয়ে গেলেন অনেকেই— এপার আর ওপার বাংলায় ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে উভয় বাংলার অসাম্প্রদায়িক জনগণ একে অন্যকে অভয় দিলেন যে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার। সে মোকাবেলা আজও চলছে রক্তের স্রোতধারায়, মানুষের মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শের পথ বেয়ে।

একটু পেছনে তাকানো যাক্। ১৯৪৮; নতুন দেশ পাকিস্তান। মুসলিম লীগ ইসলামি ভ্রাতৃবোধের জিগির তুলছে পাকিস্তানে। তার ঢেউ পূর্ব বাংলাতেও। অস্তিত্বহীনতার আতঙ্কে ভুগছে দুপারে সংখ্যালঘুরা। কি জানি কখন কী হয়! দেশ ছাড়বো কি ছাড়বো না; ছেড়ে বা যাবো কোথায়? কোন অজানা অচেনা পরবাসে! স্বাধীনতার এই করুণ পরিণতি তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন যাঁদের ঘর ভেঙেছে, ভেঙেছে সংসার। শৈশবের আজন্ম চেনা স্মৃতিকে দুমড়ে মুচড়ে পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে। এক গভীর ক্ষত নিয়ে আজও উদ্বাস্তু মানুষেরা এপার ওপার দিন কাটাচ্ছেন। দন্ডকারণ্যের ক্যাম্পে, বাংলা থেকে বহুদূরে আন্দামান নিকোবরে অথবা জীবনকে হাতে নিয়ে বেঁচে আছে রেললাইনের ধারে; কেউবা বুড়িগঙ্গা-পদ্মার চরে খড়ের চালা তুলে আবার কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত জীবনে নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে রক্ত আর ঘামে। কৈশোর অথবা যৌবনের প্রারম্ভে যাঁরাই দেশ ছেড়েছিলেন তাঁরা আজও মাতৃভূমির অকৃপণ স্মৃতি হাতড়ে ফেরেন গভীর নিশীথে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে বসে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বয়ে চলে সব হারানো শিশুবেলার খেলার সাথীদের খোঁজে, তারা আজ কেউ

কাছে নেই ..... কে কোথায়!

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঃ

পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতেই রাষ্ট্র পরিচালনার প্রকৃত কর্তৃত্ব চলে যায় উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী ভূস্বামী ও ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে তারা বেছে নেয় উর্দুভাষাকে। অথচ সে সময়ে পাকিস্তানের সাত কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষাভাষী জনসংখ্যা চার কোটি; বাদ বাকি তিন কোটি পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু, পশতু-বালুচ-সিন্ধিভাষাভাষী। পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে, দৈনন্দিন কাজকর্মে, সরকারী প্রচার যন্ত্রে বাংলা বাক্যের মাঝে উদ্দেশ্যমূলক অহেতুক আরবী উর্দু, ফারসী শব্দ বসিয়ে বাংলাভাষাকে শ্রুতিকটু ও অসহনীয় করে তোলে। এই প্রবণতা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উল্লেখ্য দেশভাগের করুণ যন্ত্রণার দগদগে ঘা না শুকাতেই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তৎকালীন পাকিস্তানী নেতৃত্ব ঘোষণা করেন—পাকিস্তান শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়; যাঁরাই এখানে বসবাস করুন না কেন সবাই হবেন পাকিস্তানী। এই ঘোষণায় পূর্ববঙ্গ থেকে অমুসলমান বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ দেশ না ছেড়ে নিজ জন্মভূমিতে থেকে গেলেন।

১৯৪৮-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তান গণপরিষদে অধিবেশন চলছে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদাহানির অশুভ পায়তারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সঞ্চারিত হচ্ছে বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও ছাত্রসমাজে। এরই মাঝে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত সর্ব প্রথম বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য পাকিস্তান গণপরিষদে দাবী তুললেন। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিধান সভার কংগ্রেস দলের সদস্য। পাকিস্তানের সংবিধান রচনা পরিষদেরও কংগ্রেসী প্রতিনিধি। পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন কঠোর ও আপত্তিকর ভাষায় বাংলার মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে ভর্ৎসনা করেন, এবং গণপরিষদে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষনা করেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের চোরা স্রোতের অন্তরালে আঘাতহী অশনি সংকেত সেদিন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মননে এক তীব্র বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ চমকে দিয়ে গেল। নড়ে চড়ে বসলেন সদ্য স্বাধীন দেশের বুদ্ধিজীবী মহল। ধর্মীয় সংঘাত নয়, সম্প্রদায়গত বিভেদ নয়, ছোঁয়াছুয়ির ব্যামো নয়— একটা জাতিকে ধীরে ধীরে তার শিক্ষা তার চিন্তনের সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে শেকড় শুদ্ধ উৎপাটনের এ এক সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি মুসলিম লীগের এই চক্রান্ত অনুধাবন করতে বাংলার দূর্ভাষ মাটিতে বেড়ে ওঠা ছাত্র যুব বুদ্ধিজীবীদের বুঝে নিতে দু-দন্ড সময় লাগেনি। এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে ১৯৪৮ সালেই পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার বলিষ্ঠ দাবী জানিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়।

পাকিস্তানী প্রশাসন পূর্ববঙ্গের ছাত্র সমাজের এই আন্দোলনকে প্রথম পর্বে গুঁড়িয়ে দিতে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে রাতের অন্ধকারে ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য সামসুল হক (তদানিন্তন মুসলিম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), ছাত্রনেতা শেখ মুজিবর রহমান (পরবর্তীকালে স্বাধীনতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পরে রাষ্ট্রপতি) ও অলি আহাদ সাহেবকে পাকিস্তান নিরাপত্তা

আইনে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সরকার পিছু হঠে। ফলে ১৪ই মার্চ ১৯৪৮ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে এক চুক্তিতে সরকার সই দিতে বাধ্য হয় এবং শর্তপূরণ করতে সামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান ও অলি আহাদ সাহেব মুক্তি পান। পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সাফল্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভেদ পন্থীরা অনেকেই পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানকে মনে প্রাণে মুসলমান বলে মেনে নিতো না। মনে করত এদের আচার আচরণে পোষাক আশাকে চিন্তনে সংস্কৃতিতে সনাতনী বাঙ্গালী সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে যা পশ্চিমবাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যেটা ছিল (এবং এখনো আছে) মৌলবাদী শাসকচক্রের শিরপীড়ার । রবীন্দ্রসাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসম্ভার শরৎসাহিত্যের চিত্রকল্প বাঙ্গালীর হৃদয় নিংড়ানো আবেগ আর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ যে সংস্কৃতি তা থেকে কিভাবে বাংলাভাষাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়কে সরিয়ে রাখা যায়—সে যুগে সেই ব্যর্থ চেষ্টাই করেছে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

১৯৪৮-এর ২১শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গর্ভণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকায় এলে ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য সামসুল হক, অলি আহাদ, তোয়াহা ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ আরো কয়েকজন রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথাবার্তায় একপর্যায়ে অলি আহাদ সাহেব মোহাম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। বিতর্কের জবাবে মিঃ জিন্না বলেন—জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রভাষা হবে শুধু একটিই এবং সেটা হবে উর্দু। এই যুক্তির উত্তরে অলি আহাদ বলেন— আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন এক ধর্মাবলম্বী ও একই ভাষাভাষী হয়েও তারা এক জাতি ও এক দেশ নয়। অলি আহাদের উত্তরে মিঃ জিন্না অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। ধর্মভীরু মোল্লাতন্ত্র অলি আহাদ সাহেবের এই ভূমিকা সেদিন ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ ধর্মান্ধতা মানুষকে তার নিজের সমাজ ও পরিবর্তনশীল উন্নততর অবস্থা সম্পর্কে অন্ধকারে রাখে। সে দেখে বটে কিন্তু পর্যবেক্ষণ করতে শেখে না। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে। অন্যদিকে বাংলাভাষাকে আরবি হরফে লিখে উচ্চারণের ব্যর্থ চেষ্টা শুরু হয় মক্তবে বিদ্যালয়ে। এরই মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্ণর হিসেবে আসেন পাকিস্তানের জনক কায়দে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। এর প্রতিক্রিয়ায় ঐ সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে উপস্থিত মানিকগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ রাজীউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্যগণ স্বতঃস্ফূর্ত 'না' ধ্বনিতে মুখের ওপর প্রতিবাদ জানিয়ে দেন। কার্জন হলে শ্লেষ আর উষ্মা প্রকাশ করে প্রতিবাদে হল থেকে বেরিয়ে প্রগতিশীল এই মানুষেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের সামনের রাস্তায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। থমথমে পরিস্থিতি। স্বয়ং গর্ভণরের ঘোষণা। ইসলামী সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয় ঐক্য সব যেন ফানুস, ফস্কা গেরো, মুহূর্তে চাবক মেরে সজাগ করলো বাঙালীকে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কেউ যেন মাটিকে চিনতে শেখাচ্ছে নতুন করে। বলছে নতুন করে পথ চলো নিজের শেকড়ের সন্ধানে।

সরকারী প্রচার মাধ্যমে চলতে থাকে উর্দু ভাষার অসহনীয় চাপ চলতে থাকে। জলকে 'পানি' সংস্কৃতিকে 'তমদ্দুন' পশ্চিমাকে 'মগরেব' সত্যকে 'ইমান' আর পথের মোড়ে মোড়ে ইসলামী ভাবধারা বহনকারী অবশ্যই-আরবীয় সংস্কৃতির চাপান-উতোর। পাঠ্যসূচীতে আ-তে অজগর না হয়ে জায়গা নিলো আ-তে অজু কর সকাল বেলা; আ-তে আম না পড়ে আল্লাহু আকবর বল সবে। সরকারী মদতে এ ধরনের ধর্মীয় সংকীর্ণতা ভিন্নধর্মালম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা বাঙালী অমুসলমান ও প্রগতিশীল মুসলমান সম্প্রদায়কে এক অস্তিত্বকর অবস্থায় ফেলে দেয়। সময় পার হতে থাকে সংশয় আর স্বপ্ন ভঙ্গের আশংকায়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০, ভাষা আন্দোলন যেন অনেকটা স্তিমিত। কি করা দরকার, কিভাবে কতদূর এগোনো যাবে; দ্বিধা আর সংশয়ে ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যগণ অনেকে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। ১৯৫০ এ প্রতিক্রিয়ার শক্তি আবার ভাষার ওপর জঘন্য পাঁয়তাড়া শুরু করে। তদানিন্তন শিক্ষামন্ত্রী বজলুর রহমান সাহেবের তৎপরতায় আবার আরবী হরফে বাঙলা লেখার প্রচেষ্টা চলে। বাংলার ছাত্র-যুবরা আবার এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সরকারী অন্দুলী হেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেতারে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া প্রায় বন্ধ হতে চলে। শোনা যায় এই শিক্ষামন্ত্রী কোন এক সভায় রবীন্দ্র সংগীত শুনে বলেন তোমরা রবীন্দ্র সংগীত লিখতে পারো না? — কেন তোমরা 'হিন্দু কবির' গান গাও? পন্ডিত বটে! এসবের বিরুদ্ধে প্রখ্যাত ভাষাবিদ সাহিত্যিক ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের প্রতিবাদ স্মরণীয় তিনি লেখেন—'বাংলা মা বাঙালীর ওপর এমন ছাপটি মেরেছেন যে টুপি দাড়ি লুঙ্গিতে আর টিকি কণ্ঠী তিলকে চিনিবার যো টি নাই'। সাহিত্যিক-নাট্যকার-সাংবাদিক সহ তাবৎ বুদ্ধিজীবীও ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদে সরকারী অপচেষ্টা সে সময়ের মত ব্যর্থ হয়।

১৯৫২, ২৬শে জানুয়ারী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে (এখন রমনা পার্ক) এক জনসভায় উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে আবারও ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষাভাষীদের তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের আপন সত্ত্বা ও সংস্কৃতির ওপর এটা ছিল এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। প্রতিবাদে পথে নামার অপেক্ষায় সমগ্র বাংলা। 'খান সাহেবগো শায়েস্তা হওনের দরকার হইছে'। পথে ঘাটে খেতে খামারে হাট-বাজারে মানুষের কথাবার্তায় চাপা ক্ষোভ; যে কোন মুহূর্তে আক্রোশে ফেটে পড়তে পারে। চূড়ান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল অতিদ্রুত। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠিত হলো। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে গঠিত হলো এগার জনের কমিটি। তাঁরা হলেন—আবুল হাসেম, আতাউর রহমান খান, কামারুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক, মহম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন, খালেক নওয়াজ, অলি আহাদ, সলিমুল্লা মুসলিম হলের সহসভাপতি মজিবুল হক ও সাধারণ সম্পাদক হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, ফজলুল হক হলের সহসভাপতি শামসুল আলম ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি গোলাম মওলা। এই সংগ্রাম কমিটি ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস বলে ঘোষণা করে, এবং সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী হরতালের আহ্বান জানায়। উল্লেখ্য ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবসটিতে পূর্ববাংলার আইন পরিষদের অধিবেশন বসার জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। চারিদিকে সাজ সাজ রব। হরতালের প্রস্তুতি ব্যানার লিখন-পোস্টার লেখা লেখি; পথে নামার প্রস্তুতি।

পাক শাসক গোষ্ঠি বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলেই

আকস্মিকভাবে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। রাস্তায় পুলিশের গাড়িতে গাড়িতে স্টেনগান আর রাইফেলের দাপাদাপি। চঞ্চলতা মানুষের কথাবার্তায় চলাফেরায়, পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে গড়াতে থাকে। সেই রাতেই নবাবপুর রোডে আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরে আওয়ামী লীগ নামকরণ) সদর দপ্তরে ভাষা সংগ্রাম কমিটি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল হাসেম। দ্বিধা আর সংশয়ে ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের মতবিরোধের মধ্যে কমিটি ১৪৪ ধারা লংঘন না করার পক্ষে সভায় রায়দান করে। সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত যখন প্রস্তাবাকারে সভায় পাস হতে চলেছে তখন অলি আহাদ সাহেব উৎকণ্ঠায় আর ক্রোধে 'না' বলে চিৎকার করে ওঠেন। সভা তার মতামত জানতে চায়। অলি আহাদ সাহেব তখন বলেন, 'যে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগিয়ে যাবো। আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করতে হবে; তা না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে।'

অলি আহাদ সাহেবের এই উক্তি সমর্থন করেছিলেন শামসুল আলম, ফজলুল হক হলের তদানিন্তন সহসভাপতি আব্দুল মতিন ও গোলাম মওলা (সভাপতি, মেডিকেল কলেজ)। অলি আহাদ সাহেবের মতামত সভায় পাশ হয়নি। তবে সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করা হলে সাথে সাথে 'সংগ্রাম কমিটি' ভেঙে যাবে। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন উত্তরণের চরম বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। সাথীরা অনেকেই পিছু হঠে যাবার পথে। অলি আহাদ সাহেব ও তাঁর একান্ত সহযোগী যোদ্ধাদের হাতে তখন ভাষা আন্দোলনের পতাকা।

রাত কেটে গেল উদ্বেগ আর আশঙ্কায়। ভোর থেকে টান টান উত্তেজনা, কি জানি কী হয়! স্টেনগান লাইট মেসিনগান উঁচিয়ে মিলিটারি গাড়িগুলোর দ্রুত গতি। এরই মধ্যে ভাষা আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিকরা চুপি চুপি জড়ো হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় বেশ কিছুটা বিরোধিতার মুখে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের প্রস্তাব পাশ হয়। সভার সভাপতি ছিলেন গাজীউল হক। এই সভায় প্রস্তাব করেছিলেন এম আর আকতার(মুকুল) । আমতলার সভাশেষে ১৪৪ ধারা আইনকে উপেক্ষা করে ছাত্র জনতার রাজপথে মিছিল নেমে পড়ে। মুহূর্তে পাকসেনার মুহূর্মুহু গুলি। রাজপথে লুটিয়ে পড়ল জব্বার, রফিকউদ্দীন ও বরকত। ভাষা সৈনিকের রক্তে ভিজে গেল রাজপথ, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের দাবাগ্নি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল শহর থেকে গ্রামে ।

এই দুঃসহ সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির রাতেই অলি-আহাদ সাহেব তাঁর সাথী বন্ধুদের নিয়ে শহিদ মিনার তৈরি করেন। ভাষা শহিদের প্রথম এই স্মৃতি চিহ্ন আজ আর নেই। তৈরির কয়েক ঘণ্টা পরেই পাকিস্তানী সেনা বাহিনী এসে স্মৃতিমিনার বুটের আঘাতে ভেঙে দেয়। কিন্তু ঐ রাতেই গোলাম মওলাকে আহ্বায়ক করে আবারও সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলো। ২২শে ফেব্রুয়ারি গায়েবি জানাজা (মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শেষ প্রার্থনা) পড়া হয়। নামাজ শেষে শোকসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক এমদাদউল্লাহ। অলি আহাদ সাহেব এই সভায় বক্তৃতা দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ২২শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র যুব বিক্ষোভে আবারও গুলি চলে।

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পুলিশ এসে অলি আহাদ সাহেবকে গ্রেফতার করে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে এই আন্দোলনের তীব্রতা পৌঁছে দেয় জনজীবনে। মাতৃভাষার জন্যে প্রাণবলিদানের মূল্য অনুভবের ক্ষেত্র উর্বর করে তোলে আপামর জনসাধারণের। ভাবিয়ে তোলে কৃচক্রী উর্দুভাষী শয়তানি প্রশাসনকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষাভাষী মানুষের দাবি প্রশাসনে ক্রমশঃ চাপ বাড়িয়েই চলে। অন্যদিকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে জেলবন্দি অলি আহাদ সাহেবের ওপর। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের অন্তরালে চলতে থাকে একটা জাতিকে তার আপন পরিচয় চিরতরে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। প্রবল বিক্ষোভে আর জনমতের চাপে অলি আহাদ সাহেব জেল থেকে ছাড়া পান, সেটা ১৯৫৩ সাল। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেলেও প্রকাশ্যে ঘোরার অনুমতি মিললো না। নজর বন্দি হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিজ গৃহে অন্তরীণ থাকতে হলো ভাষা আন্দোলনের এই বীর যোদ্ধাকে। এমনকি অলি আহাদ সাহেবকে 'ইসলামী তমদ্দুনী পোশাক' পরিয়ে ভারত বিরোধী সাম্প্রদায়িক চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হলো প্রশাসন। এই পর্বে পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে চরম বিপর্যয় ঘটে মুসলিম লীগের। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় বিপুল ভোটে। জনমতের-চাপে বিধ্বস্ত হলো বাংলাভাষাকে বিকৃত ভাষা বানানোর ফন্দি ফিকির। আরবি হরফে বাংলা পড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মুখে ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। বাঙালি তার আপন ঠিকানা খুঁজে পেল একুশে ফেব্রুয়ারি মাসে। এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আজ বিশ্বে মানচিত্রে সে স্বাধীন সার্বভৌম একদেশ অভ্যুদয় ঘটেছে। গাঢ় সবুজের মাঝে ভোরের রক্তিম সূর্যোদয় পতাকা স্থির (১৯৭১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে একুশ উদযাপন ঃ

'বারো মাসে তের পার্বন' এভাবেই পরিচিত বঙ্গের সংস্কৃতি। ধর্মীয় আচার আচরণকে কেন্দ্র করেই যার পরিক্রমা, তা কে উতরে গেছে একুশে উদ্‌যাপন। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকল ধর্মীয় গোষ্ঠি নির্বিশেষে এক মহামানবিক বন্ধন পর্ব এই একুশ।ভাষা শহিদেরা সকলে দেবতারও দেবতা, সকল পীরেরও পীর, অবতারেরও অবতার; তাকে রাখি কোথায়! কোন মনিকোঠায়? যে শহিদস্তম্ভ বৃটের আঘাতে চুরমার করেছিল পাক সেনা তা আজ কোটি কোটি খণ্ডে নব নব সৈনিকের হৃদয়তন্ত্রীতে তরতাজা ফুল। বাংলাদেশে এমন একটা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যেখানে ভাষা শহিদ স্মরণে মিনার গড়ে ওঠেনি। এটার জন্যে কোন সরকারি নির্দেশ জারি হয়নি। ভাষা ও জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র যে শিক্ষাঙ্গন, ভাষা শহীদ স্মরণে মননে স্বতঃস্ফূর্ততায় তা আজ বঙ্গের সংস্কৃতির অঙ্গ। ভাষা শহিদ স্মরণে বাংলাদেশের মানুষ পথে নামেন খালি পায়ে একুশে ঠিক রাত বারোটা এক মিনিটে।হাতে ফুল গাঁথা মালা।' সবারই গতি শহিদ মিনারের দিকে। বীরে নতশিরে সারিবদ্ধ হয়ে বিনম্র স্বরে বরুন আকুতি— 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কী ভুলিতে পারি?'

[জাতিসংঘ 'মাতৃভাষা দিবস' বলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে মনোনীত করেছে। প্রতিটি দেশেই মাতৃভাষাকে মর্যাদা দেবার জন্য এই দিনটি নতুন শতাব্দীর প্রথম বছর থেকেই পালন করা হবে। এ প্রবন্ধটি সেই তারিখটির উৎস ও পরিণতি নিয়ে লেখা।] সম্পাদক 'অ'

সাহিত্য ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার ঃ তাঁর আদি বিস্ফোরণ 'শবরীমঙ্গল'

আবুবকর সিদ্দিক

।। প্রথম পর্ব ।।

'প্রতিক্ষণ' পাবলিকেশনসের বারো ভলিউম ছাপিয়েও এই জন্মশতবর্ষে এখনো উপচে পড়ছে কবি জীবনানন্দ দাশের বিপুল গদ্যসম্ভারের মরণোত্তর আবিষ্কার। এই সন্তসদৃশ অবিশ্বাস্য সংযম তথা প্রকাশকুণ্ঠা ও স্রেফ মহাকালের চরণে ন্যস্ত সাধনধনের পর্বতপ্রমাণ অর্ঘ্যের ঘটনা বর্তমান মিডিয়ামুখ্য বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। পসৃথিউমাস জীবনানন্দ দাশ এখন একাই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁরই মত আরেক স্বয়ংপ্রতিষ্ঠান কমলকুমার মজুমদার, তবে ভিন্ন ডাইমেনশনে। তাঁর বহুমুখী কারিশমা, বোহেমিয় লাইফস্টাইল, আদিগন্ত পাণ্ডিত্য, ব্লেডের মত দুধারী মেধা ও শিল্পিত শ্লেষ, মিডিয়ালাঞ্ছিত সমকালের তোয়াক্কা না করে মুষ্টিমেয় রচনায় স্বস্তিবোধ, — এ সবই আজ ক্রমাগত কিংবদন্তী ও প্রবচনের প্রসূতি। কমলকুমার মজুমদারের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ শিল্পমূল্যায়ন এখনো মহাকালের মর্জিনির্ভর।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস আসলে তার বিষয় ও আঙ্গিকের ইতিহাস। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ কথা বলে সীল মেরে দেয়ার একটা প্রবণতা চালু হয়ে উঠছিল কিছুদিন ধরে। কিন্তু তাঁদের পরও নতুনতর আধুনিকতার উপাদান নিয়ে এসে যান দুই মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও কমলকুমার মজুমদার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ধ্রুপদী ও সমাজনিষ্ঠ বটে অমিয়ভূষণও এবং তদতিরিক্ত জটিল ও অন্তরাশ্রয়ী এক সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের কারিগরও। কালধর্মের অভিঘাতে নরনারীর সম্পর্কের ভাঙাগড়ার দার্শনিক দুজনেই যদিও, তুলনায় অমিয়ভূষণ বহুগুণ নিমোহি। আর এদিকে কমলকুমারের ধাতই আলাদা। সময়ের দিক দিয়ে অগ্রজন্মা ও শিল্পরুচির দিক দিয়ে আপসহীন পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিতীয় লেখক কমলকুমার মজুমদার, যাকে নিজের কথা প্রকাশক্ষম নিজস্ব গদ্যশিল্প নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। নবীনতা দেবসেনাদের মারমুখী মারকাটের, (''পিঞ্জরে বসিয়া পাঠকঃ এবং অথবা শুদ্ধ তান্ত্রিকের শব্দসাধনা'', 'চতুরঙ্গ', কলকাতা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪) পরও আজ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত, কমলকুমারীয় গদ্যফরম অভিনব অত্যাধুনিক। আর তাঁর বিষয়প্রসঙ্গ নিয়ে এটুকু অন্তত বলা যায়, জহুরীরা এখনো অমনোযোগী।

পটভূমি-চরিত্রায়ন-বিষয়-শিল্পআঙ্গিক, উপন্যাসের এই চতুর্বর্গ নির্মাণ পরিকল্পনাতেই কমলকুমার স্বতন্ত্র ও স্বকীয়। বিদেশী উপন্যাস 'টিনড্রাম', 'হাড্রেড ইয়ারস্ অব সলিচিউড', 'ইউলিসিস', 'দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন', 'রিমেম্বারস অব পাস্ট টাইম', ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' এবং বাংলা উপন্যাস 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', (জগদীশ গুপ্তের গল্পউপন্যাস)-এর মত 'অন্তর্জলী যাত্রা' তথা কমলকুমার মজুমদারের যে কোন উপন্যাস (গল্পও) যেমন নন্‌ট্রাডিশন্যাল, তেমনি সম্পূর্ণ স্বনির্মিত। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৬৩-তে ইন্দ্রনাথ মজুমদার সুবর্ণরেখা থেকে 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে

একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে বসেন। বিশেষ করে, এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বৈদ্য চাঁড়াল বাংলা উপন্যাসে অ্যান্টিট্রাডিশনের মূর্তিমান প্রতীক আর তার প্রগল্‌ভ বাক্কোয়াজী তো সনাতন ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দর্শন। স্বল্প পরিমাণ সৃষ্টির মধ্যে কমলকুমার অভিনবত্বের অনেক আশ্চর্য নজীর রেখে গেছেন। যেমন আর্চিন বা টোকাই অর্থাৎ ব্রাত্য কিশোর চরিত্র অঙ্কনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। তাঁর সুঘরাই যুবনাশ্ব, সতীনাথ, সমরেশ বসু (আশির দশকের খিঁচা কবালাসমেত) প্রভৃতি সবার সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যায়। কাহিনী, ভাষা, চরিত্রকল্পনা, সব কিছুতে কমলকুমারের উদ্ভাবনী মেধা বেপরোয়া ও অবিশ্বাস্য। তাঁকে নিয়ে এ যাবৎকাল যত ব্যাখ্যা-বিতর্ক হয়েছে, তা অপরিমিত। ব্যক্তিক রুচিকোণ প্রসূত হওয়ার দরুণ তা অধিকাংশই আরোপিত প্রক্ষেপ। নিরপেক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য পর্যবেক্ষকদের মধ্যে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা মডেল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কমলকুমার মজুমদারের নাড়ীনির্ণয়ে তাঁর 'অন্তর্বয়ন' ধর্মী উদ্‌ঘাটন আংশিক অনুসরণ করা যাক ঃ (ক) 'বাস্তববাদের এই নিদারুণ সঙ্কটেরই একটি দিক প্রতিফলিত কমলকুমার মজুমদার নামক ফেনোমেনানে। এই সঙ্কট থেকে মুক্তির এক প্রবল প্রচেষ্টা তিনি করেছেন এককভাবে, পরম্পরাহীনভাবে। প্রায় শতাব্দী ব্যাপী বাংলা বাস্তববাদের ঔপন্যাসিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তিনি এগোতে চাইলেন। এক অদ্ভুত স্ববিরোধ তাঁর মেটাফিজিকস ও বাস্তববাদবিরোধী কলাকৌশলের মধ্যে' (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অন্তর্বয়ন কথাসাহিত্য', একুশে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ১৯৯০, পৃ. ১১৫)।

(খ) 'বাস্তববাদকে ধ্বংস করেই তাঁর বীক্ষাটিকে উপন্যাসের শিল্পকর্মে আনতে হবে' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬)।

(গ) 'এ এক কল্পস্বর্গের প্রতি তাঁর যাত্রা' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

পার্থর শেষ কথা ঃ কমলকুমার এক খামখেয়ালি খেলার ব্যর্থ প্রতিভা। এই ব্যর্থতার সারনিদান তিনি এ ভাবে বিশ্লেষণ করেন। 'কমলকুমারের ব্যর্থতা এখানেই— তিনি তাঁর পূর্ব প্রজন্ম বা তার আগের প্রজন্মর প্রদত্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুধাবন না করে, অস্বীকার করে, মৌলিক হতে চেয়েছিলেন' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০)।

পার্থপ্রতিমের এ বিশ্লেষণ আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে এ জন্য যে, কমলকুমারের ব্যর্থতার মূলে যে ব্যক্তিগত খামখেয়ালের প্রকোপের উল্লেখ করেন তিনি, তার সামাজিক শ্রেণীপ্রেক্ষিতটাও কিন্তু ঋজু তর্জনীসংকেতে শনাক্ত করে দেন এই সমীক্ষায় পৌঁছে। 'তবে এটা কমলকুমারের একার ব্যর্থতা নয়। পঙ্গু, দিশাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ব্যর্থতা এটা' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০)।

তবে কিনা পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মেধার-বাতানুকূল বিচারের পরও কথা থেকে যায়। কমলকুমার নামক হিমবাহের জলমগ্ন বিশালাংগ কি জরিপসাপেক্ষ নয় এখনো? মহাসৌরবিশ্বের এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্তাদি সাজিয়ে জুড়িয়ে একটা আপাতজ্ঞানকোষের সংকলন খাড়া করা যেমন সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানী মণীষীদের দ্বারা, তেমনি সেই সব উপাত্তকণিকার অনালোকিত অদৃশ্যলোকে যে বিপুল অমেয় তিমিরাচ্ছন্ন তারকাকুল মূল সত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বিরাজ করছে এখনো, কোন নব প্রজন্ম তাদের ভাষ্যনাদ ও ভাষ্য দান করবে?

বিষয়, ভাষা ও নেপথ্যশায়ী মনোদর্শনের জটিল ব্যাপ্তির দরুণ কমলকুমারের রচনা বহুমাত্রিক তো বটেই, চ্যালেঞ্জ মেলে ধরা এক দুরধিগম্য বাকবিশ্ব যেন বা। তাঁকে অতিমানবীয় বলতে না পারি, দানবীয় বলতে দ্বিধা বোধ করিনে। অবশ্য উপরের আলোচনা থেকে কমলকুমারের মনোযোগের ক্ষেত্র বলতে ব্রাত্যজনবিষয়ই একমাত্র বা সমগ্র বলে প্রতীতি হতে পারে। স্বীকার করা উচিত, এ বিষয়টি কমলবিশ্বের একটি আংশিক তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিপর্ব। সমাজের অত্যুচ্চ চূড়াবাসী অভিজাত নরনারী-চিত্রণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সেও আরেক বিস্ময়কর জগৎ। এখানেও প্রচলিত মার্কাগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ নিজের মত স্পর্শাতীত বলয় তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। এ এক স্বতন্ত্র বাবুসমাজ। এক অদ্ভুত শৈলীতে সুদূর গ্রহলোক রচনা করা হয়েছে। অনিলা, সুহাসিনী, গোলাপসুন্দরী প্রভৃতির ত্বকরেখা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সূক্ষ্মতম নিকট-সম্পর্ক লেখকের। আর তাদের বিচিত্র সব ইডিয়োসিনক্রেটিক অভিব্যক্তি এবং আধাস্ফুট সংলাপ, প্রতিটি ডিটেইল খুব ধরে ধরে গড়ে তোলেন তিনি, যা একমাত্র ফরম ও রেখা এবং আলো ও ছায়ার বিমূর্তচারী আধুনিক চিত্রশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এছাড়াও, সঙ্গীত স্থাপত্য-গণিত-চিত্রকলা-অভিনয়-ভাস্কর্য-নৃতত্ত্ব-প্রকৌশল প্রভৃতি বিচিত্র সব মানববিদ্যায় কমলকুমারের প্রায় অতিমানবিক অধিকার। অবিশ্বাস্য এক মহাকোলাজের সমাহারে বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে একক প্রতিভায় দূরযানী উচ্চতায় তুলে দিয়েছেন তিনি।

কমলকুমারের ভাষারণ্যে প্রবেশ করা যাক এবারে। তাঁর গদ্য এক নতুন ও মেধাময় অনুশীলন—তাতে সন্দেহ নেই। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী বয়নের মাধ্যমে বিষয় এবং ভাষা যখন সাযুজ্য-সংহতিতে পৌঁছয়, তখন এক অনন্য শিল্পবিকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শুভ সংগতিসাধন কমলকুমারের গদ্যে দুঃখজনকভাবে শুধুমাত্র প্রাথমিক চর্চার স্বাক্ষর হিসেবে রয়ে গেছে। পরে ক্রমাগত নিজস্ব রুচিবাতিক (যা অচিরে শুচিবাতিকে পর্যবসিত), নবনিরীক্ষার মারাত্মক উৎকটপনা, বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুরধার প্রয়োগবিলাস ও বিশুদ্ধ আভিজাত্যগর্ব এই গদ্যশিল্পকে (সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুকেও) এক বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ লিপিকর্মে বিকলাঙ্গ দশাপ্রাপ্ত করেছে। যতই মেধাঋদ্ধ হোক না কেন, এ রকম গদ্য পরিণামে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। গতিহীন এক কূটাবর্তে আত্মবিনাশী রতিরঙ্গ ছাড়া আর তো কোন তৃপ্তির লেশ থাকে না। যেন এক চিতল হরিণ তার নিজের মনোহর শিঙের প্যাঁচে অরণ্যবন্দী করে বসে আছে নিজেকে। এই ডাইলেমাটিকে চিহ্নিত করেই পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় কমলকুমারকে সমাজবিচ্ছিন্নতার কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করান। আর মারকাটআলাদের উল্লাসের সুযোগটাও এই ছিদ্রপথেই। কমলকুমারের এহেন আত্মধ্বংসী গদ্যের অন্তত একটি নমুনা উদ্ধারযোগ্য সংগত কারণেই ঃ

'আমি সেই যে আপেলত্বে ঠেস দিয়া আছে, ইহাতেই চৌরঙ্গী আশ্রিত যে সুমহৎ পরিপ্রেক্ষিত তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাই নহে এখন যে এবং যুগপৎত্ব ক্ষণ সমাগমে অপরীক্ষায় নিঃসাড় হইয়া জলদি প্রতিনিবর্তিত হইল মৃত্তিকায়, ইহা জীবজ প্রতিজ্ঞা, এবং জলে ইহা জীবজ সমৃদ্ধি এবং মারুতে ইহা জীবজ বৈচিত্র্য আঃ!' ('কশ্চিত জীবনচরিতঃ তিনটি খসড়া', 'গল্পসমগ্র', কমলকুমার মজুমদার, পৃ-৩৭৮)।

অথচ এই একই কলমের কারিগর যখন সংগতির রেখা ধরে চলতে চান, আমাদেরকে এক

অলৌকিক স্বর্গে নিয়ে যান তখন। তাঁর একটি অজ্ঞাতপ্রায় গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

'ইহারা যাহারা নিতম্বের জন্য গর্ব্বিতা, যাহারা পয়োধরের জন্য উন্নাসিক, যে এবং তলপেটের সুশ্রী বিজাপুরী লক্ষণের জন্য (দক্ষিণ ভারতীয় বঞ্চ) যাহাদের নিজেদেরই মতিভ্রম ঘটিয়াছে, আর যে ওই লোকের যাহাদের চিন্তা স্ত্রীলোকঘটিত, কে কেমনভাবে উহাদের সুখী করিবে তাহারা ঘোষণা দেয়, ইহারা বালক প্রেরিত উপস্থিত অন্ধকারকে শুষিতে আছিল' ('খেলার আরম্ভ', 'গল্পসমগ্র', কমলকুমার মজুমদার, পৃ-২৭০)।

'চতুরঙ্গ' যদি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ননট্রাডিশন্যাল ধারায় আদিপদক্ষেপ, জাতপাতের ভেদ মনে রেখেও মেনে নিতে হয়, 'অন্তর্জলী যাত্রা' ননট্রাডিশন্যাল বাংলা উপন্যাসধারায় আধুনিকতম। জটিল মনন, বৈদ্যুতিক মেধা ও অভিনব সব প্রতীকী চিত্রপট এই দুশো পৃষ্ঠার উপন্যাসটিকে একটা তুঙ্গ ও অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। শিল্প সৌকর্যের বিচারেও তাঁর অন্য পাঁচটি উপন্যাস থেকে এ উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সগোত্র যদি জ্ঞান করতেই হয়, তবে তার উইনে 'খেলার প্রতিভা', বাঁয়ে 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' তথাপি 'অন্তর্জলী যাত্রা' কালযাত্রী হিসেবে একক। হালে চতুর্দিকে নানারকম সাক্ষ্যপ্রমাণ সংযোগে উপসংহার টানা হচ্ছে এভাবে। কমলকুমার মজুমদার প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর ভাষা প্রপঞ্চ ও জীবনভাবনার আভিমুখ্য আঠারো-উনিশ শতকের ক্ষয়িত অতীত, যা প্রগতিবিরোধী ও বিজ্ঞানবিমুখ। এই লঘুভ্রম সরলীকরণ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা পর্যন্ত কমলকুমারের সত্যমূল্যায়ন অসাধিত রয়ে যাবে। রচনাবলীতে মাধব বা রামকৃষ্ণ-নাম শিরোধার্য করে যাত্রাশুরুর অভ্যেস তাঁর সাধারণ ধর্ম। অধিকাংশের ধারণায় এটা কমলকুমারের এক ধরণের মৌলবাদী পশ্চাদ্‌গতি; উপরন্তু নিঃশংসয়িত ভাববাদী ভঙ্গি। উনিশ শতকী উপচার সমন্বয়ে যে নতুন গদ্যসিনট্যাক্সের জন্ম দেন তিনি, তাঁর বিরুদ্ধে রুজু করা আগের অভিযোগকে তা আরও পোক্ত করে। একাধারে হস্তীমূঢ় কেতাবী পাঠক্রিয়া ও অন্যদিকে বামপন্থী বিচারপদ্ধতি যখন যান্ত্রিক প্রবণতার বশীভূত হয়ে পড়ে, তখনি এ ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়া, মানবতাবাদ বনাম মানবতাবিরোধিতা ইত্যাদি কূটাভাসনির্বিশেষে ধর্ম ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট শব্দাদি শ্রবণ ও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্জিক হয়ে পড়ার লক্ষণও ফুটে ওঠে। যে ধর্ম মানুষকেই সবার উপর সত্য বলে অকুণ্ঠ ঘোষণা দেয়, তাকে কী করে প্রতিক্রিয়াশীল ছাপ দেয়া সম্ভব? আচারমাধ্যম ও জাতপাতের পাকে আবর্তমান ধর্মাচরণকে রামকৃষ্ণদের একধরনের স্বকীয় সুগমসমন্বয়ে মুক্তি দিতে ব্রতী হন। তাঁর ভানভেক-বর্জিত বেশভূষা ও ব্রাত্যজনের আকাঁড়া প্রাকৃত ভাষা এই মুক্তির লোকায়ত দোসর। রামকৃষ্ণদেবের এই দেশজ মুক্তিচর্চা পরে শিষ্য বিবেকানন্দের পৌরুষস্পর্শে বিশ্বমানে রূপান্তরিত হয়। নিম্নবর্ণের চরিত্রের মুখের সংলাপে রামকৃষ্ণদেবের মডেল থেকে একচুল সরে আসেননি কমলকুমার। বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর দূর অস্ত, যুবনাশ্ব-সমরেশ বসু- সতীনাথের ছাঁচকেও ছাপিয়ে গেছেন কমলকুমার। তাঁর অংগুলিমেয় যৎসামান্য রচনাবলী থেকে সহস্রাধিক উদাহরণ তুলে দিয়ে দেখানো যায়, নিম্নবর্গের মানুষের সংলাপগদ্য নির্মাণে কমলকুমার অনতিক্রান্ত। তাঁর তিনটি গল্প ও 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস থেকে পরপর উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

(ক) 'তারপরও শালা বামুন—ও যার বাড়ি যাবে তারাই বলবে, ঠাকুর কড়া চাপাও—না

হলি ফুসমন্তর বিধান, পাঁজী খুলে বলবে, বেগুন পুঁতছে তেরেওদশার দিন—ফসল হবে কলা, বামুন বে দে চার আনার পয়সা—'। ('জল', 'গল্প সংগ্রহ', কমলকুমার মজুমদার, পৃ-৪০)।

(খ) 'এরপরই সে বিড়ালের মত ফ্যাস করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না... না?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না....' ('নিম অন্নপূর্ণা', পূর্বোক্ত, পৃ-১২৩)।

(গ) 'বামুন আর জন্মে তুমি জজ ছিলে গো, আল্লা করে তুমি একভাতারী ঘুসকী পাও' ('কয়েদখানা', পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮)।

(ঘ) 'চিতায় যে কত লোক আমার হাতে ঠেঙা খায়, আমার দরদ নাই ...' ('অন্তর্জলী যাত্রা', পৃ-১৩৩)।

(ঙ) 'আমি বড় গতরক্যাঙলা লোক গো, কনেবউ, তুমি পুড়বে, আকাশ লাল হবে, ভয়ে গোরু পর্যন্ত বিইয়ে ফেলবে গো। তুমি গেলে, কি আর বলব আমি চাঁড়াল, দেশে আকাল দেখা দেবে.... লাও.... লাও.... তুমি পালাও.... কনেবউ পালাও' (পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৩)।

(চ) 'এক গল্প বলি হে, তোমার রঙ যেমন দুধে আলতায়, আমার রঙ তেমন দুধে আলতায়, ... কেনে? যে কোম্পানী উপরে, সে আমাদের রক্তে দুধ দিইছে, যেমন তোমাদের বুকে দুধে দেয় গো, আমাদের রক্তে দুধ দিইছে, আমাদের রক্তে দুধ দেয় হে! চিতার আগুন আমার কিছুই চ্যামটে খয়রা করেনি হে, বড় কষ্ট হয় তাই .... যা কিছু, জেনো বটে হে শ্মশানেই আমার আঠা.... তোমার শাপ মনে লয়, আমার মনে ডাঙ্গাডহর আছে, বীজ বৈখরী ..... চায় ..... পাপ আছে .....' (পূর্বোক্ত, পৃ-১৮১-৮২)।

আবার বলি, এমন কি যে 'লোয়ার ডেপথ্' চরিত্রমালা চিত্রণে 'কল্লোল' কুল থেকে শুরু করে সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, মহাশ্বেতা দেবী সবাই কট্টর বাস্তবগ্রাহী, সেই একই কলাবিধিতে কমলকুমার সুপাররিয়্যালিস্টিক শুধু নন, নৈরাত্ম্যসিদ্ধিতে সার্বভৌম। বাংলা সাহিত্যের নিরেট কমলহীরেগোষ্ঠী তাঁর এই সাবল্টার্ন সদস্যরা। এদের প্রোথিত করা হয় যে ভাষাভিত্তিতে, তাও তাঁর একান্ত স্বখাত। নৈকষ্য কুলীন থেকে কক্‌নীড দুই দূরসম্পর্কের শব্দচূর্ণ, বাচনভঙ্গিমা, অ্যাভরেজ উইন্টের উর্ধ্বচারী অসিধার জেল্লা-ধাঁধানো ইডিয়েমেটিক দুর্দর্ষ কথকতা, কমলকুমারীয় এই শিল্পভুবন গোটাটাই বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত, বলতে ইচ্ছে করে, দ্বিতীয়অসাধ্য। যথেচ্ছ নির্বাচন থেকে কিঞ্চিৎ স্বাদ উদ্ধার করা যেতে পারে।

(ক) 'শনিচারোয়া সেদিন না আসাতে সুঘরাই ভিতরের বারান্দা ঝাঁট দিতে ছিল, তদীয় পাখিটি নিকটেই এই উহার গাত্রে সকালের রোদ বেলোয়ারি, যাহা সহসা সুঘরাই অবলোকনে আবিষ্কার করিল, যাহাতে সে অতিশয় তন্ময়, এতদ্ভাবাপন্ন রহিতে ক্রমে, তাহার সারা দেহ এক যাদু আবেগে তছনছ, রোমকূপে ঘোর শব্দ বহিয়া হৈ দিয়া উঠিল' ('পিঞ্জরে বসিয়া শুক', ঘাসফুলনদী, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ-৪২)।

(খ) 'এখন অন্ধকারে যা ভয়ঙ্কর— মেলাখেলার লে-তরাবট তরমুজী রাঢ়ের মত, আঁট নেই আঠা নেই; দেহে ঝরি নামবে তত্রাচ পিরীত পাবে না। সেই জমিকে আপনার বলে, নিজের শির বলে মনে করে কি না!..... কথার জবাব সে পেয়েছিল, ফলে তার শরীর দশমরদ হয়ে উঠল'

('কয়েদখানা', 'গল্পসমগ্র' পৃ-১৪৪)।

(গ) 'লে লে খোকা মার শারা ক্ষেপা ঢ্যামনাকে আশি সিক্কা'— বলে নিজের কব্জিতে একটু আরাম দিতে দিতে তুখড় মাগীমাচকান চোখে চারিদিকে চাইতে লাগল' ('তাহাদের কথা', 'গল্প সমগ্র', পৃ-৮৭)।

(ঘ) 'এই মধ্যরাত্রে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের বুকে পীতধড়া বনমালা পরিহিত কালো ছোঁড়ার চাপল্য জোয়ার হানিল। আশ্চর্য হাতের ফেরতাই দেখা দিল, তেহাই পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিল' ('অন্তর্জলী যাত্রা', পৃ-৮৮)।

(ঙ) '..... আঃ রমনী! আঃ আশ্চর্য! যে তুমি দুটি অব্যক্তকে একই দেহে—যে দেহে, সূক্ষ্মতা, আলো পায়, ধারণ কর। এক হৃদয়ে অন্য জরায়ুতে। তুমি সেই লীলাসহচরী (পূর্বোক্ত,পৃ-১৬৩)।

(চ) 'আঃ! কি তাহার চোখ, মধ্যপ্রাচোর ভূমিলক্ষ্মী! যাঁহার বরে, চামটে জমি ঝামরিয়া উঠে; সেই উর্ব্বরাবতী, উর্ব্বরদা দেবী লক্ষ্মী। ইহার নিম্নঅঙ্গ যে কোন হতাশাকে দ্রাক্ষারিষ্টে জিয়াইবে, আঃ ঐ উর্ব্বরদা দেবীর ময়নযুগলের নিকট আকাশ দাসখত দিয়াছে। চোখ মহাস্থানগড়ের শবরীর যেমন', ('খেলার প্রতিভা', কমলকুমার মজুমদার, তাম্রলিপি, ২৬ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-১৩, ১৯৭৭, পৃ-৩০)।

(ছ) 'আঃ কি বা মনোরম ঐ জল আনার ঘটা। ... ... আঃ জল আনার দৃশ্য যে কত মহৎ, কত স্নেহ, কত না ছবি! কত গীত! এখন ঐ টিনেতে যাহা আধার যাহাতে মাধুর্য্য বুঝাইল, ললিত বৃত্তি ধ্বংস হইল না; কেন না, ওই মেয়েছেলেটির কাঁকরেখার পরমাদ্ভুত বক্রতা, অহো ধনুকে জ্যা রোপণ হইবে, সমবেতের আদেখিলা করিয়াছে; এই মেয়েছেলেটি এবার পা বাজাইয়া স্থিত হইতেই এক ছলাৎ জল পড়িল। ... ... আর এই মেয়েছেলেটি, জলবাহিকা, আপন গতরে এক লতান স্পন্দন খেলাইয়া, তির্য্যক নেত্রপাত করত, মহাভানে ব্যক্ত করিল, মরণ!' (খেলার প্রতিভা', পৃ-২৮)।

কমলকুমারের জাদুকরী ভাষার অন্যতম বৈভব হচ্ছে; অকল্পনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর পরম্পরায় পর্যবেক্ষণের সাবলীল স্বভাব। যেমন ঃ

(ক) 'নিশ্চয় ওই ফুল বক্র বা সরল রেখা ধরিয়া পড়ে নাই, জিগজাগভাবে পতিত হয়, অজস্র যুক্তির আঘাতের দরুনই তাহা ঘটে'। ('লুপ্ত পূজাবিধি', 'গল্পসমগ্র' পৃ-১৯০)।

(খ) 'পয়োধরের আওয়াজ নাই যে পয়োধর দুগ্ধভিক্ষার্থী।' ('কঙ্কাল এলইজি', 'গল্পসমগ্র', পৃ-২৪৪)।

(গ) 'তাহার ধর্ম্মশীল মুখোল কলমে অঙ্কিত মুখখানিতে', (পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৫)।

(ঘ) 'যে বেচারীর কোলে শিশু, সে এবং নিকটস্থ শহীদস্তম্ভের পশ্চাৎ আড়েনে আশ্রয় লইল। ছোট ছোট পাছাগুলোতে এখন রোদ, আমরা সূর্য্যকে ঠিক দিলাম' ('কালই আততায়ী', 'গল্পসমগ্র', পৃ-৩২৫)।

(ঙ) 'ইহাদের পেট এমন পড়িয়া কালো যে যাহাতে অন্ধকার ছিটাইয়া যায়! ইহাদের চক্ষু এমত কেটিরাগত যে কাঁচ ছিদ্র খাইতে থাকে। ইহাদের হস্তপদ এমন প্যাংলা যে বেদব্রাহ্মণ কান্দিতে আছে! ইহারা নিজেদের জন্য লজ্জিত, ইহারা চক্ষু নামায়।

হায় আমরা, যে আমি, এতকাল পুতুলের বিনিময়ে পাহাড় চিনিয়াছি, সেই সে থ! এস, আমরা পুতুলে ফিরিয়া যাই—সেই ভাল! আঃ ইহারা সেই যাহারা হয় আকাশের নকল! প্যারডি নহে। ঠাকুর তুমি ইহাদের, হাভাতে ক্ষুধার দ্বারা, মমতা পচাও নাই। ঠাকুর তুমি ইহাদের এমন গড়িয়াছ যে ইহাদের মনে কানা পোকা নাই। ঠাকুর তুমি ইহাদের ভালতে হাজা মজা দাও নাই!' ('খেলার প্রতিভা', পৃ-৫)।

(চ) 'সে ইরানীদের অশ্বের মতন চিহিঁহিঁ করিয়া নিমেষেই ঐ রহস্যকে বিশেষ চানকাইতেছে; মেয়েছেলেরা স্তনবৃন্তে নখাঘাতিল, বেটাছেলেরা একে অন্যের কড়া থুপাইয়া টনক হাতড়াইল এবং তাহা সকলের গাত্র সিঞ্চিড়াতে স্পন্দমান থাকিয়াছে; যে এ সময়তে অন্নক্লিষ্ট যান্ত্রিক শব্দে চৌকিদারী হাঁক পাড়িল; এবং উপর্য্যুপরি ঐদৃশ ব্যাকুলতা নির্ম্মিত হয়!' ('খেলার প্রতিভা', পৃ-৫৩)।

যে সম্পূর্ণ অভিনব কলাপ্রকরণে গড়ে তোলা ধ্রুপদী বাকপ্রতিমার অধীশ্বররূপী কমলকুমার এক স্বয়ং ইনস্টিটিউশন; তার ঈষৎ আভাস:

(ক) 'ক্রোধ হইতে কাম সঞ্জাত (!) হইল, দিকসকল তমসাচ্ছন্ন, তিনি এহেন ঘন্টায় একাকিনী, আপনার সুদীর্ঘ অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন, আপনার আয়ত্তের বহির্ভূত হইলেন। পলাশের উষ্ণতা এখানে নিঃশেষিত বিকারগ্রস্ত হইবেক, বহুধা ধমনীর মধ্যে কখনও সূক্ষ্ম-হাস্য খিলখিল করিয়া উঠিল, এখন স্ফীত হয়; সুন্দর সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় উর্দ্ধে চিত্রশরীরে উঠিয়া সৌরজগতে পথ হারাইল' ('অন্তর্জলী যাত্রা', পৃ-১৬২)।

(খ) 'এমত সময় একদল সাঁওতাল সারিবদ্ধভাবে ঐ টিলা অতিক্রম করিতে ক্রমে উঠিল, তাহারা নির্জ্জন প্রবাহ, তাহারা অদ্ভুত পায়ে চলিতেছে, তাহার তাঁহাদের ইতিমধ্যে দিয়া যায়, ইহাতে এক আজব আড়াল সৃজিত হইল', ('পিঞ্জরে বসিয়া শুক', পৃ-৪৫)।

(গ) 'ঐ সকল কাগজের টুকরাসকল তখনও উড়িতে আছে আঃ ক্ষণজীবী পতঙ্গসকল! তুমি সুঘরাইকে একটুকরা কুড়াইতে নির্দেশ দিলে, টুকরা আনীত হইল—তাজ্জব, তুমি আজন্ম সংস্কার ভুলিলে, তুমি কি নেটিভ! আনীত টুকরা পাঠে তুমি অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ, কি এক বেদনা তোমাতে স্ফুটমান হইতে চাহিল, তোমাতে বাকা বৈখরী হইল, কিন্তু ঝাপটা হাওয়াতে উহা গোঙানির ন্যায় বুঝায়' ('পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮)।

(ঘ) 'তবু রঞ্জিত চ্যাটার্জি, মৃত্যুর গন্ধকে অবয়ব আকারে তখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই; কেবলমাত্র মনে হয় আপনার মস্তকের হাড়ে দ্রবীভূত, জীর্ণ আর যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইল, একটি পতঙ্গে সমস্ত শরীর রূপায়িত। লক্ষ্য করিলেন, হস্তদ্বয় পক্ষের ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে অথবা কোন আদিম নৃত্যের ভঙ্গীতে; এখনও, একদা দেখিলেন, উৎকৃষ্ট করিছিয়ান স্তম্ভ যাহার শীর্ষে মৃত্তিকার প্রতিজ্ঞা; তিনি ভীত ত্রস্ত অভিভূত' ('অনিলা স্মরণে', পৃ-৫০)।

আবার বলি, এত সযত্ন জুয়েলারী, এত পার্ফেকশনবিলাসী বয়ন, এমন বিচিত্র বহুরূপী স্বরহার্মনাইজেশন বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য-আধুনিক কোন যুগে আর সম্ভব হয়নি।

যদি বলি, শব্দে-পদপ্রকরণে-বাকশৈলীতে তাঁর যে অসংখ্য ওরুচগুলী সংশ্লেষ, তা আসলে এক সচেতন নিরীক্ষার স্বাক্ষর, নামান্তরে—'মুখচ্ছদ' যার অভিধা, আধুনিক সাহিত্যের এক

বিশেষ কারিগরিপনা; তাহলে কি পংক্তির আসনখানি রক্ষে পায় তাঁর? হ্যাঁ, এ সবই এক ঐশ্বরিক শিল্পের নির্মাণছলা; মুখচ্ছদের প্রতীকাধারে মূল মুখখানিকে নবতর ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তোলে। 'ওঁ মাধবায় নমঃ'-ও আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট স্বরূপের উপর-পরতে একটি রূপগ্রাহ্য মুখোশের আচ্ছাদন। আর আছে স্ববিরোধিতার সমবায়ে টেনশন বা আততি সৃষ্টির নন্দনকলা। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ক্যানভাসটাই সেইমত ছকের উপর দাঁড়িয়ে। একদিকে নদীতীর-শ্মশানচিতা-নামসংকীর্তন-অশীতিপর সীতানাথের খাবি খাওয়া নাভিঃশ্বাস, অন্যদিকে বিয়ের বাসর ছুঁড়িবউয়ের সহমরণপ্রস্তুতি বিয়ের গীত যণ্ডমার্কা সন্তানদের উৎকট বিষয়বিকার বৈজু চাঁড়ালের ভোগবাদী উস্কানি ও জাগতিক উপেক্ষার আপ্তদর্শন। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন বহুবিচিত্রধর্মী টেনশন নির্মাণ অভূতপূর্ব। এমন কি পরস্পর বিরোধী সাধু ও প্রাকৃত তথা ব্রাত্য শব্দ ও বাক্‌রীতির যে সহাবস্থান, সেও আততি সৃষ্টির পরিণামে নান্দনিক ক্লাইম্যাক্স গড়ে তোলার সার্থক নিরীক্ষা বৈ আর কিছু নয়।

কমলকুমারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্নামেরও একটা দাঁতভাঙা জবাব অন্তত 'অন্তর্জলী যাত্রা'তেই মজুত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে প্রবল প্রচলিত সতীদাহপ্রথা ও কৌলীন্যবিবাহ প্রথাকে তিনি বৈজুনাথ চণ্ডালের মুখ দিয়ে চাবকিয়ে রক্তাক্ত করেছেন। এদিক দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' ও কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' সগোত্র। দুজনেরই আয়ুধ শ্লেষ ও সমালোচনা, তবে তুলনায় ওয়ালীউল্লাহর দিকে ঝুঁকির পাল্লাটা বেশি। কারণ তিনি কশাজর্জর করেছেন তাঁরই সমকালীন ধর্মান্ধতাকে। আর কমলকুমারের টার্গেট তাঁর থেকে শতবর্ষ আগের ধর্মীয় ফেরেববাজী।

কমলকুমার মজুমদার এক বহুমাত্রিক কথাশিল্পী। যদিও নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অনেক যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তিনি নিজের হাতেই তুলে দেন তাঁর বিরুদ্ধ তাঁবুর কৌসুলীদের হাতে। বার বার বলতে চাই তবু, সত্য কমলকুমার এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। বাংলা কথাসাহিত্যকে সেন্টিমেন্টাল ট্যাবু থেকে টেনে তুলে ঋজু মেরুদণ্ডের উপর ভর দেবার শিক্ষা মানিকের পরে তিনিই দিয়েছেন।

এই দীর্ঘ সমীক্ষার শেষে কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে একটা সাধ্যসাপেক্ষ চূড়ান্ত মূল্যায়নে তো আমাদের পৌঁছনোর কথা। চল্লিশের দশক থেকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘের প্রণোদনায় যে গণসাহিত্যের দীক্ষা ও সূচনা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-ননী ভৌমিক-গুণময় মান্না-সুশীল জানা প্রমুখের হাতে), কমলকুমার তাকে বুর্জোয়া পিঁজরাপোলে আটকিয়ে ফেলতে যত্নপর হন (উঁহু, বরং বলা উচিত, সেই ক্রান্তিকারী আন্দোলনকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজেই বকেয়া ইতিহাসে পর্যবসিত হন)। সুবোধ ঘোষ আগে 'ফসিল' লিখে— তবেই 'তিলাঞ্জলি'তে ফিরে এসে শঙ্খের কয়েদী হন। আর কমলকুমার 'শবরীমঙ্গলে' আদিবাসী জীবনের প্রতি সংবেদনশীল ও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় বিদ্রোহী অন্ত্যজ চণ্ডালের মুখে আচারসর্বস্ব সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে মুক্ত মানবিকতার উদ্গাতা হয়েও আখেরে উচ্চকোটির বাবু সংস্কৃতির কমিটেড সেবাইত।

আর এখানেই উত্তরণ মহাশ্বেতা দেবীর। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিশীল বেগে সামিল হতে

পারার সুবাদে জংগম হয়ে ওঠে তাঁর ব্রাত্যসাহিত্য। কী গদ্যবর্ণনায়, কী অন্তর্দার্শনিক চেতনায় চেটি মুণ্ডা, বসাই টুডু ও অন্যান্য শবর-খেড়িয়া-লোধা চরিত্ররা প্রগতির বিনির্মাণে নিয়ামক অংশ হয়ে ওঠে।

অতঃপর বাংলা উপন্যাসের আরেক নব্য আধুনিক পর্বের সূত্রপাত ১৯৮৮-তে বাঘারুর পদযাত্রা থেকে। পাঁচশো পৃষ্ঠা পরিক্রমার পরও দেবেশ রায়ের কলমে তার সে অভিযাত্রা অব্যাহত। গণশত্রু আপলচাঁদ, গণবিরোধী তিস্তা ব্যারেজ, নতুন সাজিয়ে তোলা সরকারি ফরেস্ট, তথাকথিত অর্থনীতি, ঢক্কানিনাদিত উন্নয়ন;— সব বহুাড়ম্বরকে 'প্রত্যাখ্যান' করে ব্রাত্য বাঘারু। "এই প্রত্যাখ্যানের হাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক .. ..." (দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত,' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৯০, পৃ-৫০৪ (শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন)।

।। পর্ব দ্বিতীয় ।।

১৯৭৯-তে কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর সহধর্মিনী দয়াময়ী মজুমদারের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা লেখকের বেশ কিছু অপ্রকাশিত রচনা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। দয়াময়ীরই সহযোগিতায় ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার স্বরলিপি প্রকাশন থেকে ছেপে বের হয় কমলকুমার মজুমদারের একটি প্রায় অজ্ঞাতপূর্ব উপন্যাস 'শবরীমঙ্গল'। বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে দয়াময়ী জানিয়েছেন, এ উপন্যাসটি 'রবিবাসর'-এর শারদীয় সংখ্যায় ১৯৮৩-তে (১৩৯০) প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি আরো জানান, 'শবরীমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্ভবত ১৯৫০ থেকে '৫৫-এর মধ্যে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বই আকারে প্রকাশকাল, আমরা জানি, ১৯৫৩। কিন্তু জানি না এই 'শবরীমঙ্গলে'র প্রথম রচনাকাল। তবে 'অন্তর্জলী যাত্রা'র পূর্বে যে লিখিত, তা অনুমেয়। 'শবরীমঙ্গল' বাংলা কথাসাহিত্যে কমলকুমারের এক আদিবিস্ফোরণ, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনিবেশ নিয়ে পড়লে বোঝা যায়, 'শবরীমঙ্গল' বস্তুত 'অন্তর্জলী যাত্রা'র অগ্রজ। ভাষাভঙ্গি ও বিষয় উপস্থাপন উভয় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত সহজ মানুষ কমলকুমার মজুমদার। যদিও তাঁর স্বকীয় চরণের ভিন্নতর পথরেখা এখানেই স্পষ্টত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে লেগেছে। কাহিনীর ক্যানভাস প্রত্যন্ত আদিবাসী মানুষেরা, গদরীতিতে বিশেষ মোচড় দেয়া কমলকুমারী ঘরানা এবং পর্যবেক্ষণের সেই বহুমাত্রিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এই গোটা পরিমণ্ডলের আবহপট রচনায় কমলকুমার যেমন অভ্যস্ত, তেমনি সিদ্ধহস্ত। কেবল যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র মত পার্ফেকশন এত আগেভাগে অর্শিয়ে পারেনি। বিশেষ করে লক্ষণীয়, শব্দের পারস্পরিক চেইন, বানান ও বিরামচিহ্নের স্থাপন বিশৃঙ্খল। অথচ আমরা তো জানি, কমলকুমার শুধু শব্দ নয়, তার ধ্বনি ও গন্ধ নির্বাচনেও ওস্তাদের ওস্তাদ। কাজেই গলদ যে অন্য হাতে ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সোজাসুজি মুদ্রণপ্রমাদ বলতে যা বোঝায়, বিপদ তার চেয়েও গভীরতর। ত্রুটিগুলো বালকের অধম। অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না, ছাপাখানার করণিকদের হাতে পড়ে এই নাজেহাল অবস্থা। হতে পারে, মূল পাণ্ডুলিপি অথবা তার থেকে অনুলিপি করে নেবার দায়িত্ব পালনে কোথাও কোনো ব্যত্যয়ের কারণ ঘটেছে। প্রায়ই তো কপি করতে দিয়ে অনেক চক্ষুষ্মান অন্ধের অপটু পাণ্ডিত্য সহ্য করতে হয় মূল লেখককে। আর যে লেখক আগেই ধরাধাম থেকে

বিদেয় নিয়ে বসে থাকেন, তাহলে তো নাচার দশা। মোটামুটি এটুকু টের পাওয়া যায়, মৃত কমলকুমারের উপর অপদেবতার আছর ঘটেছে। 'অপদেবতার আছরে'র কথা যখন উঠলই, অপ্রিয় প্রসঙ্গের উল্লেখ তাহলে মিটিয়ে নেয়া ভাল। না হলে ইতিহাসের ক্ষতমুখ বালিচাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা থেকে যায়। আগেই বলেছি, এই উপন্যাসটির বই আকারে বেরিয়ে আসার পিছনে কমলকুমার পত্নী দয়াময়ী মজুমদারের অবদান আছে। এটা বাইরেকার প্রতিবেদন। এবং ভিতরে ভিতরে অনিয়ন্ত্রিত সুযোগের অসদ্ব্যবহারে 'অবদান' যে আসলে অপদানের দক্ষিণার রূপান্তরিত চেহারা ধরেছে, সেটা হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 'কবিতীর্থ' পত্রিকার (১৮) নবম বর্ষ আশ্বিন ১৩৯৪ (সেপ্টেম্বর ১৯৮৯) সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'কমলকুমার মজুমদার: মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে ধরিয়ে দিয়েছেন। তবে তার আগে আমার দেয়া তথ্যে যে গলদটা রয়ে গেছে, তা শুধরে নেবার দরকার। বলেছি, 'শবরীমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয় 'রবিবাসর' পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা ১৩৯০/১৯৮৩ খ্রী: অর্থাৎ কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যুর বছরে) সালে শারদীয় সংখ্যা 'এক্ষণে' সর্বপ্রথম এই উপন্যাসের অংশবিশেষ ছাপার মুখ দেখে। মূল নামে নয়, 'অপ্রকাশিত রচনা' শিরোনাম দিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী এর দুটি পাতা (মূল পাণ্ডুলিপির ১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠা) ছেপে দেন। সঙ্গে দেয়া একটি সম্পাদকীয় নোটে তিনি লেখেন, "রুলটানা ফুলস্কেপ কাগজে ২৬০ পৃষ্ঠায় এই উপন্যাস সম্পূর্ণ—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, প্রথমের ১০৭ পৃষ্ঠা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাষা ব্যবহারে সঙ্গত কারণেই মনে হয় এই উপন্যাস কমলকুমারের প্রথম জীবনের রচনা। অল্প পরিশোধিত। এখানে ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হল" (হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, 'কমলকুমার মজুমদার: মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব', কবিতীর্থ—১৮, নবম বর্ষ আশ্বিন ১৩৯৬, পৃ-৭৮)। 'রবিবাসর' পত্রিকায় এই ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ শুরুর ১ পৃষ্ঠা থেকে ১০৭ পৃষ্ঠা ব্যতিরেকে) থেকে উপন্যাসের সূত্রপাত। এবং ছাপা হতে হতে তা ২৬০ পৃষ্ঠার মূল পাণ্ডুলিপিকে ছাপিয়ে গেছে। মূল পাণ্ডুলিপিকে ছাড়িয়ে যায় ছাপানো লেখা! এখানেই নিহিত রয়েছে তাবদানের উপর অপদানের আছর হওয়ার রহস্য। ব্যাপারটা হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবৃতি থেকে খোলসা হয়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'রবিবাসর' পত্রিকায় ওই ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা থেকেই উপন্যাস শুরু হয়েছে এবং দীর্ঘ একটি রূপ নিয়েছে—যা পাণ্ডুলিপির ১৬০ পৃষ্ঠা থেকে বেড়েছে দয়াময়ীর হস্তাবলেপনে। সুব্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মুদ্রিত অংশে এবং 'রবিবাসরে' ছাপা উপন্যাসের প্রথম পাতার লেখায়—অনেক পার্থক্য আছে। দয়াময়ী মজুমদারই তা সংশোধন করেছেন। ঠিক কোনখান থেকে দয়াময়ীর রচনা সংযুক্ত হল এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। যাঁরা কমলকুমারের সন্ধানী পাঠক তাঁরা ছাড়া সবাই 'শবরীমঙ্গল'কে কমলকুমারের রচনা বলে গ্রহণ করবেন এমনভাবে মুদ্রিত হয়েছে আগাগোড়া'(ঐ, পৃ-৭৮০)।

সঙ্গত কারণেই হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমারের মৃত্যুর পর মুদ্রিত তাঁর সমস্ত অপ্রকাশিত রচনার মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন: 'এই দুটি ঘটনা (অন্য ঘটনাটির কথা এর পরই বলতে যাচ্ছি) থেকে কৌতূহলী পাঠকের কাছে কমলকুমারের মৃত্যুর পর সম্পাদিত নয় এমন কোন অপ্রকাশিত রচনাই দয়াময়ীর হস্তাবলেপনেসম্পূর্ণ বলে সন্দেহ থেকে গেল''(ঐ,পৃ-৭৮)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে কমলকুমার মজুমদারের 'পিঙ্গলাবৎ' গল্প নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর তিন

বছর পরে প্রশান্ত মাজি সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার অক্টোবর ১৯৮২ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। গল্পের শেষে দয়াময়ী একটি বিচিত্র ঘোষণা দিয়ে পাঠকদের বেকুব বানিয়ে ছাড়েন। তার আগে জানিইনি, গল্পটি মূলত অসম্পূর্ণ ছিল। দয়াময়ী দয়া করে কলম চালিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করেছেন। ঘোষণাটি শুনুন: 'পিঙ্গলাবৎ' কমলকুমার মজুমদারের পূর্বলিখিত একটি অসম্পূর্ণ গল্প। পাঠকদের কাছে গল্পটি উপস্থাপিত করার মানসে— কয়েকটি ছত্র সংযোগে একটি সাময়িক পূর্ণচ্ছেদের প্রয়াস আশা করি মার্জ্জনীয়।' দয়াময়ী মজুমদার তাঁর ইগোর চাপলাবশত এই যে অমার্জনীয় ধৃষ্টতার কাজটি করলেন, বাংলা সাহিত্যে তার যে স্থায়ী (সাময়িক নয়) জের রয়ে যাবে এবং সে জের অবশ্যই অপরাধমূলক, তার কী জবাবদিহি করবেন তিনি? ভাবা যায়? যে কমলকুমারের মুখের উইট ও আয়রনি মাখা বচনকে সমকালীন আঁতেলরা জুজুর মত ডরাতেন, যাঁর লেখায় দন্তস্ফুট করতে সতিই দাঁতভাঙা দশা হত পাঠকদের, বিষ্ণু দের মত বিদগ্ধ কবিকে জ্ঞানপীঠ 'বাগানো'র ফিকির বাৎলে দেবার জন্যে যিনি প্রকাশ্য আড্ডায় তক্ত করতেন, 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র সম্পর্কে যাঁর মনোভাব জানার জন্যে সত্যজিৎ রায়কে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে হয়েছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যাঁর স্মৃতিমূলক রচনার নাম দেন 'দৈত্যকাহিনী', সেই কমলকুমার মজুমদারের অসমাপ্ত গল্পকে নিজের ভাষা দিয়ে ভরাট করা, তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে দাগা বুলনো, এই দুঃসাহস কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়েও আমাদের মনে প্রভূত ধন্ধ আছে। মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর আইনগত অধিকার বিবাহিত স্ত্রীতে বর্তায়। তা বলে কমলকুমার মজুমদারের মৌলিক রচনার একটি অক্ষরও এদিক ওদিক করবার অধিকার বা বিদ্যেবুদ্ধি তাঁর স্ত্রী কেন, অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে (তা তিনি যত বড় প্রতিভাধর হোন না কেন) আমরা কল্পনা করতে পারি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন হাজার রাজশক্তির নির্দেশেও দ্বিতীয় কারো পক্ষে রচনা করার সাধ্য নেই, কমলকুমারের লেখাও সংস্কার করার সাধ্য ও অধিকার নেই কারো। এই অপকর্ম্মো করে দয়াময়ী মজুমদার নিজেকে তামাশার মানুষে পরিণত করেছেন। জীবিত কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বিধবা যশোবতীর জন্যে অনেক সংবেদনা প্রকাশ করেছেন। মৃত কমলকুমারের আত্মা তাঁর বিধবা স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদারকে দয়াধন্যা করতে পারবে কিনা, সন্দেহ। তবে এহো বাহ্য।

'শবরীমঙ্গল' বাংলা উপন্যাসে কমলকুমার মজুমদারের আরো একটি মৌলিক যোজনা, তাতে সন্দেহ নেই। সমঝদার পাঠকসমাজের জন্যে এ এক মূল্যবান সুসমাচার। পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্তশায়ী আরণ্য ক্যানভাস নিয়ে গড়ে উঠেছে 'শবরীমঙ্গলে'র কাহিনীপট। সুনির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক অঞ্চলভূমির জানান দেননি কমলকুমার। কথার ফাঁকফোকরে কিছু কিছু জনপদ, নদী ও হাটগঞ্জের নামোল্লেখ মেলে, এই যা। তা থেকে মোটামুটি একটা আঞ্চলিক মানচিত্রের আঁচ করে নেয়া সম্ভব। তবে উপন্যাসের ৫৪ পৃষ্ঠায় কমলকুমার নিজে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে একটা রূপরেখা দিয়েছেন:

'পূর্বে (আর্যা সীমারেখা) কসাই-এর আর দূরে, পশ্চিমে সুবর্ণরেখার আরও পরে যারা, উত্তরে কৃষ্ণসার মৃগভূমি (?), নিম্নে ব্রহ্মণী যেখানে অস্থি বিসর্জন দেয়, অথবা মহানদী গ্রীষ্মে যা পার হতে সাগর কুড়ার (ছোট নীল কাল পাখী, যার ঠোঁট বাঁকা) চোখ গলে যায় ইতিমধ্যে

যারা শাল সাত্তার নিমের বনে বনে, যারা একা দুটো গ্রন্থি জেনে স্থির' ('শবরীমঙ্গল', কমলকুমার মজুমদার, স্বরলিপি, ২৩-এ কেশবচন্দ্র সেন, স্ট্রিট, কলকাতা ৯, ১৯৮৪, পৃ-৫৪)।

এ রকম স্থানিক চিত্রাভাস বইটির যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া, এই আদিবাসী এলাকার অজস্র স্থাননাম, নদীখাল, হাটগঞ্জের নামের ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন; বৈবতী, গুইটিলা, পাঁছড়ী, হড়তি, কর্সুডিহি, গৈর পাহাড়, হাঁইসদো নদী, কুমার নদী, ফুলডার হাট, তামাড়ির হাট, বুলডার হাট ইত্যাদি। একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে; আদিবাসী অধ্যুষিত এই ভূ-খণ্ডের ম্যাপ ও তার মানুষগুলোর জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুষঙ্গ কমলকুমারের সম্পূর্ণ নখদর্পণে। ফলে এখানকার মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বৃক্ষ, জীবনাচার, ভাষা, টোটেম ও ট্যাবু অবলীলাক্রমে গ্রন্থিত করেছেন তিনি।

'শবরীমঙ্গল' নাম থেকেই আন্দাজ করে নেয়া যায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'শবর' নামক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকথা এ উপন্যাসের মুখ্য বস্তু। যদিও 'শবর' শব্দটিও সারা বইয়ে প্রায় অনুল্লেখিত। মাঝে মাঝে মুণ্ডা-ওঁরাও প্রভৃতি গোষ্ঠীনামের উল্লেখ আছে, তবে সেও কথাচ্ছলে। ফলে নির্ধারিত কোন এক বা একাধিক গোষ্ঠীকে কাহিনীর আওতাভুক্ত করায় বাধা আছে। 'শবরীমঙ্গল' নামের মধ্যেই যেন কোন শবরীকন্যার কাহিনীর প্রলোভন রয়েছে বলে মনে হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপিলা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদেনী বা সাঁওতালীকন্যা কিংবা, এমন কি, আল মাহমুদের জলবেশ্যার মত কোন উগ্রযৌবনা কামবতী অন্ত্যজা কন্যার রগরাগে পরকীয়া গল্প এখানেও হয়ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ কমলকুমার তাঁর বহু রচনায় প্রাকৃত জীবনের উদোম যৌনতাকে উদোমতর বর্ণনায় মেলে দিয়েছেন: 'ঘাটে সুহার পিঠে সাবান মাখাইবার কালে সে তাহার, অভিজ্ঞতা ধরাগলায় বলে যে, 'তুলসী আর আমি উচ্ছে তুলছিলুম, ওর নজরে পড়ল টগর তার বরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে, তুলসী আমায় বললে চচ টেকিখেলা দেখবি' .... (সুহাসিনীর পমেটম', কমলকুমার মজুমদার, ১৯৮৩)। এমন কি, আত্মস্মৃতিমূলক রচনাতেও কমলকুমার অম্লান কলমে লেখেন মুলতানের বেশ্যাপল্লীতে বিচরণকালে বয়োজ্যেষ্ঠ মামার যৌন বিকারের কথা। ভাগ্নেকে বেশ্যালয়ের দরোজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে মামা ভিতরে ঢুকে যান ও কয়েক মিনিট পরেই পাওনা টাকা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। আর তখন বেশ্যা স্ত্রীলোকটি দড়াম করে বেরিয়ে এসে নাবালক ভাগ্নের সামনেই উর্দুতে খিস্তি ঝেড়ে মামার ডান হাত ধরে হিড় হিড় করে আবার ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

কমলকুমারের মূল বর্ণনা:

'মুলতানের বেশ্যাপল্লী বড় অদ্ভুত! এখানে মাটির দেয়াল উঠানের উপরে লোহার গরাদ দেওয়া বা কাঠের সেই আলোতে দেখি একটি খাটিয়াতে নগ্ন মেয়েছেলে, খেউরি হইতেছে — রোমশ —ইহা কামায়! এখানে ঐ মামা এ ঘরে যাইবে। কামাইতে আছে মেয়েটি আমারে একলা দেখিয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করে। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। ঐ মামার জন্য বিরক্তি (?) বোধ করিলাম, ইতিমধ্যে মামাকে যাহার কক্ষে সে যায়— সেই মেয়েটি অল্পবয়সী—হঠাৎ, বস্ত্র আচ্ছাদন নাই, তদীয় বিভিন্ন রঙের চুড়ি হস্তে আছে যাহার— ওই মামার কব্জি ধরিল— 'বিজার যাতা!' ওই মামা আবার কহিল 'বাড়ি! ঘর! হোটেল! পয়সা তরূপয়া ত দিয়া!'

মেয়েটি—'উসমে কেয়া হ্যায়!' ওই মামা— তবে? মেয়েটি কহিল—'হামারা নেই হু আও বইঠো!' (শুনিয়াছি উহারা কিছু খাইতে দেয় হাকিমী দাওয়াই মোদক)' (হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ববৎ, পৃ-৫০)।

সে সবের তুলনায় কমলকুমারের কলম 'শবরীমঙ্গলে' বিস্ময়কর ভাবে শীতল। রোমনি নামে এক শবরীনারীর জন্যে মাধালি নামক এক আদিবাসী খ্রীষ্টান যুবকের গুপ্ত প্রেমজ্বর এবং তার উত্তাপে টালমাটাল নায়কের আত্মরক্ষার জন্যে ভগবানদর্শনের ব্যর্থ উন্মাদনা, পাশে কুণ্ঠাক্রান্ত অদ্বৈত মিশ্র, কোলিয়ারীর আড়কাঠি সুবাই, মহাজন মাকড়ী, মাধালির বোন লুহানী প্রভৃতির আন্তঃসম্পর্কীয় টেনশন নিয়ে ১৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই উপন্যাসের কাঠামো।

বইটি শেষ করেও শবরী বা শবর নামের সুব্যাখ্যা কিন্তু পাই না আমরা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় শবরদের একটি আদিবাসী উপজাতিগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৯৪১-এর আদমশুমারীর রিপোর্টে শবর বা শাওরাদের ভারতীয় বিস্তার এভাবে দেখানো হয়েছে:

'শবরে'রা, পাহাড়ের গায়ে ধাপে আলবাঁধা খেত তৈরি করে এবং তার সঙ্গে অতিসুন্দর কৌশলে সেচ ব্যবস্থাও করে থাকে। এই ধাপ বাঁধা কৃষি ('Terraced cultivation') যাদের আয়ত্ত তারা কৃষিকলায় যথেষ্ট উন্নত সন্দেহ নেই।' (সুবোধ ঘোষ, 'ভারতের আদিবাসী', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ-১৪৯)।

আদিবাসী শবরদের উল্লেখ রামায়ণ আদি মহাকাব্য 'রামায়ণে' পাই আমরা। সেখানে গণনায়ক রামের জন্য এক শবরীনারীর যুগ যুগান্তের অটল প্রতীক্ষা পাঠকের মর্মকে করুণ রসে আর্দ্র করে তোলে। 'শবরীমঙ্গলে' কমলকুমার মজুমদার সমাজের প্রান্তবাসী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী শবর সম্প্রদায়ের নরনারীদের একটি ক্লোজ-শট চিত্রানুবাদে উপস্থাপন করেছেন। তবে একটি কথা, আমার মনে হয় 'শবর' শব্দটিকে কমলকুমার এখানে একটু ব্যাপক অর্থে আলঙ্কারিক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। মূলত, খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের নিয়ে তাঁর এই উপন্যাস।

এ রচনার দুটি প্রধান সম্পদ; লেখকের অসাধারণ এবং টিপিক্যাল ভাষাশিল্প ও আদিবাসী জীবনধারা সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো বিস্তারিত বলবো। এখন এই প্রারম্ভিক তথাটি জানা দরকার, কমলকুমার এখানে কথ্য বাচনরীতি অনুসরণ করলেও বানানরীতিতে প্রাচীনপন্থী (যথা: পর্য্যন্ত, আশ্চর্য্য, উর্ব্বরা, ধর্ম্ম, পাখী ইত্যাদি)।

চরিত্রগুলি এরকম: রোমনি এক ঝুমুরওয়ালী নারী, উপন্যাসের নায়িকাও, কমলকুমারের উদ্দিষ্ট শবরীকন্যা। লেখকের বর্ণনায় 'বিরাট সুন্দরী মেয়েটি।' এই রোমনি কাহিনীর আগাগোড়া মাধালির প্রেমকামনায় মরমে মরমে 'হ্যাদাইছে'। আর মাধালি বৈবতী গ্রামনিবাসী ঘুনড়ী খ্রীষ্টানের ছেলে এক দশাসই বুনো খ্রীষ্টান। দেহে যেমন বুনো, মেজাজেও তেমনি গরম বুনো। তবে অতান্ত ধর্মবাধ্য পুরুষ। এবং সে-ই এই কাহিনীর রোমনিবল্লভ নায়ক। যদিও গোটা বইয়ে কোথাও তাদের সরাসরি প্রণয়আলাপ বা নিবিড় কোন মিলনদৃশ্য নেই। মনে মনে একে অন্যকে চেয়ে শুধু বনে বনেই ঘুরে মরেছে। কমলকুমারের এ এক সৌখীন অথচ হৃদয়সংবেদী প্রেমাখ্যান। অদ্বৈত মিশ্র এক পূর্ণবয়স্ক কুণ্ঠাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, যাকে রোমনির মা 'নষ্ট' করে রেখেছে, তবু ব্রাহ্মণত্বের বড়াইয়ে সোচ্চার। আবার রোমনির প্রতিও তার পরকীয় টান (পৃ-২৫)। লুহানী

মাধালির বড় আপনটানের বোন। মাধালি রোমনির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ এড়ানোর জন্যে বুনো পথে ঘুরে ঘুরে চার্চে পৌঁছে ভগবানদর্শনের জন্যে তড়পে মরে। আর ভাইসোহাগী লুহানী তার জন্যে শালপাতায় ভাততরকারী নিয়ে দিনের পর দিন বনডহরে কেঁদে কেঁদে ফেরে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় সাঙা করবে। পাদরী ফ্রান্সিস মাধালির প্রতি অসীম করুণাপরবশ। তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। ঠিক তার পাল্টা দুর্জন চরিত্র হচ্ছে সুবাই, যে আসলে এক ধূর্ত আড়কাঠি, লেবারদের খাটিয়ে অচল পয়সা দেয় ও কাশীধামের লোভ দেখিয়ে কোলিয়ারীতে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে। আবার ফুলড়ার হাটে জুয়ো বসিয়ে দুয়ানা বাটা নেয়। মাধালির প্রতি তার নীচ ঈর্ষা। মাধালি তাকে হাতে হাতে শিক্ষা দিতে গিয়েও ঘোয়ায় এড়িয়ে যায়। মাকড়ী চরিত্রটি একটি টিপিক্যাল শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ। মাধালির ভগবদ্‌ভক্তিকে ভ্রূকুঁচকে উড়িয়ে দেয়। অথচ তার বউ এবং বিহাসী, লৈবী প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্র মাধালির প্রতি মুগ্ধ। এ ছাড়াও, পিটার, খাজুরী, নিমাই হরকরা প্রভৃতি কিছু গৌণ চরিত্রের আনাগোনা আছে। এরা সব সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও উপেক্ষিত, অধিকাংশই কুলিকামিন। নগ্ন দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গি। বসন বলতে কোমরের ঘুনসী ও ঠেঁটি। আর অশন হল মাড়ভাত, ভুট্টার খৈ, গুড়, ব্যাঙের ছাতা (ওরা বলে 'ছাতি') ইত্যাদি। 'কাঁটাহরের (কাঁঠালের) বিচি' এদের খুব প্রিয় খাদ্য। আর মৌ আঁওলা নামক বিশেষ মদ এদের প্রিয় নেশাবস্তু। এরা পারকোমে বসে বসে চুটা টানে আর আড্ডা দেয়। রেড়ীর তেল জ্বালিয়ে দিশা দেখায়।

কাহিনীর গতিধারা এ রকম: ঝুমুরওয়ালী রোমনি, যে কিনা নিজে ডুগী বাজিয়ে গান গায় নাচে, তার বাড়িতে আদিবাসী খ্রীষ্টান ধীরোদাত্ত যুবা মাধালির উপস্থিতি। এবং তার পর পৃষ্ঠায়ই অভিভাবকের ভান দেখানো অদ্বৈত মিশ্রের আবির্ভাব। এই অদ্বৈত জেতে বামুন কিন্তু কুষ্ঠরোগে দরবিগলিত। অপিচ রোমনির মা তাকে আগেই 'নষ্ট' করে রেখেছে এবং এখন এই বুড়ো ভামটি রোমনির দিকে ছোঁক ছোঁক করে চোখ ঠারে (২৫ পৃষ্ঠায় তার এই চোরা টান ফিক করে বেরিয়ে পড়েছে)। আর তার চোখের উপর মাধালি-রোমনির আলাপ বড্ড 'বেলেল্লাপানা' বলে বোধ হয়। ৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক রোমনি-মাধালির প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের বর্ণনায় যত্নপর। আর তার আড়ালে অদ্বৈত মিশ্রের চাপা মনস্তাপ। রোমনি ঘর থেকে নেমে গিয়ে তুড়সীকে পাঠিয়ে দেয়। রোমনির রেখে যাওয়া 'পারকোমের লিচে মৌ আঁওলা আর কাঁচ গিলাস' বের করে মাধালি মদ পান করে। তার ও অদ্বৈতের মধ্যে এটা নিঃশব্দ দ্বন্দ্ব ঘুঁইয়ে ওঠে। একসময় অদ্বৈত মিশ্র ও মৌ আঁওলা টেনে বুঁদ হয়। জটিল পরিস্থিতির চাপটা থিতু হতে হতে মাধালি ও তুড়সীর প্রস্থান। কিন্তু মাধালি আর সে মাধালি নেই। রোমনির জন্যে তার হৃৎকমলে জেগে ওঠা কালো ভ্রমরের গুপ্ত আর্তিতে সে উন্মাদপ্রায়। না পারছে রোমনিকে সরাসরি পাঁজর মেলে দিয়ে নিজের রক্তক্ষত তুলে ধরতে, না পারছে রোমনির নিবেদনকে আদিবাসীয় সরল আমিষকামনায় বরণ করে নিতে। এ এক আত্মবিধ্বংসী শোচনা। খ্রীষ্টিয় শুচিচেতনা ও পাপবোধ মাধালিকে হাতীর শুঁড়ের শক্তিতে পিছুটেনে রেখেছে। চার্চের সুবিশাল প্রভাব ও স্টীয়ক অনুশাসন তার স্বতঃস্ফূর্ত মানবিকতাকে গ্রাস করেছে। অথচ নাগপাশের অধিক নারীর আকর্ষণ (বিশেষ করে, যে ভারতীয় নারীকে কমলকুমার এই গ্রন্থেই 'জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রমণীর সৌন্দর্য্য' (শ.ম., পৃ-১৩৫) হিসেবে শিরোপা দিয়েছেন) মাধালির অবচেতন স্নায়ুমণ্ডলীকে কুচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। বস্তুত, 'শবরীমঙ্গলে' প্রত্যক্ষ কোন প্রণয়চিত্র নয়, বরং প্রণয়ের অংকুশাহত মাধালির নিগ্রহযন্ত্রণার হাহাকারই এক ক্লাসিক শিল্পোৎকর্ষের জন্ম দিয়েছে। হয়ত সমস্তরের নয়, তবু সেয়ন মুজতবা আলীর 'শবনম' উপন্যাস নায়িকাকে হারিয়ে নায়কের একটানা হাহাকারের অপূর্ব শিল্পরূপায়ন মনে পড়ে যায়। রোমনির দুর্মর মায়া থেকে বাঁচার জন্যে মাধালি বনে বনে চুঁড়ে হাঁইসাদো নদী পেরিয়ে চার্চে এসে আশ্রয় নেয়। অসুস্থ মানুষের মত ছটফট করে, পবিত্র বইবেলের শ্লোক আওড়ায়। আর তখন এক শবরীকন্যার উদয়, '... ... তার খোঁপা বাঁদিকে টানুনী কারণ সে তীর ছোঁড়ে। অনেক পাখী খরগোস ইঁদুর মারে। ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে তার দেহ ঐশ্বর্যে ঘাড় কাত করে আছে, তার চোখে অফুরন্ত জল' ('শবরীমঙ্গল', পৃ-৪৯)। তার বড় বড় দুখ। বরটি মধু পাড়তে গিয়ে গলায় রক্ত উঠে মরেছে। বুড়ো বাপটি বোধবিকারবর্জিত। কিন্তু তার দুঃখকে ছাপিয়ে দ্বিগুণ বেগে প্রোজ্বলিত হয়ে ওঠে মাধালির আপন চিত্তদাহ। 'লাঙলের মত সহজ-সরল শক্ত ছিল বাপ, তারই ছেলে মাধালি, একাই খড় বোঝাই গাড়ির চাকা দমে গেলে তুলতে পারে, খেতে পারে, ছুঁতো করে লোকের সঙ্গে মারপিট করে' (ঐ, পৃ-৫২), যার ঠাকুরদা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফাঁসি নিয়েছে, 'সেই মাধালি মৃগীর মত মুষড়ে মুষড়ে উঠছে।' ফিলিপ পাদরীর কাছে সে গড় গড় করে কনফেশন করে। রোমনির নাম নিয়ে বলে ফেলে, 'আমার মনে হয়েছে আমি তাকে সবকিছু দিতে পারি ... ...'। আরো তীব্র কণ্ঠে বলতে থাকে, '... ... এ কে এলো হে ... ... বিটিছানার পেটকে সন্তান আসে, আমার ইখানে কে সেন্দাইল ... ...?' নিজের ভিতরে অবৈধ লিবিডোর এই তীব্র অনুপ্রবেশকে মাধালি কমলকুমারীয় জীবন্ত গদ্যে ব্যক্ত করে: 'আবার এই দুখ্ কেনে—ভিতরে কুকুর সেন্দাইছে—কার্তিকের কুকুর মত—।' এই দুর্বলতার পাল্টা রক্ষাকবচ হিসেবে প্রভু যীশুকে আঁকড়ে ধরতে চায় সে, প্রভুদর্শনের জন্যে আকুল হয়ে ওঠে: 'আমি তাঁকে দেখবই', 'তিনি কি আমায় দেখা দিবে?' মাধালি চার্চ থেকে পাদরী ফ্রান্সিসের কুঠিতে উঠে আসে। এখানে খলস্বভাবী সুবাইয়ের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে সৌজন্যালাপ চলে কিছুক্ষণ। তারপর লাংড়াতে ল্যাংড়াতে সুবাই চলে যায়। পাদরী ফ্রান্সিসের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধর্মালোচনা। মাধালি ভূতগ্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফেরে। সেখানে লৈবী, মাকড়ী, বিলাহী, পিটার প্রভৃতি স্বজন ও প্রতিবেশী খবর পেয়ে তাকে দেখতে আসে। বোন লুহানী দরদ দিয়ে ভাইকে যথাসাধ্য সেবা করে। ভোররাতের দিকে মাধালির আবার অন্তর্ধান। প্রতিবেশী রমণীরা এসে মাধালি প্রসঙ্গে তাদের প্রচ্ছন্ন ভালবাসার কথা বলতে থাকে:— 'ইখনও ও খুঁজছে গো, মানুষটা পাই পইসা হইল গো।' কিন্তু বিস্তবান মাকড়ী তাদের অনুরাগকে বিদ্রূপবিদ্ধ করে। মাধালির জন্যে সবাই হন্যে হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত লুহানী তাকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পায়। কিন্তু মাধালি তো আর ফিরবে না। তার যে ভগবানকে দেখতে না পেলে নয়। হাঁড়িয়া খাওয়া 'টুপভুজঙ্গ' লোকের মত মাধালি বুঁদ হয়ে থাকে। তার দুবাহু ধরে নাড়া দিতে দিতে লুহানী বলে, 'হেই মোর দাদা গো—!' মাধালি লাল চোখে বলে, 'আমি ঘরকে যাব না হে, আমি বুঝে লিব—' ... ... 'আমার ডানা চাই আমি পথ দেখি লুব—।' কিন্তু দোকানদার মাকড়ী হরিয়া তাকে বন্ধ করেই চলে। লুহানী একা ঘরে ফিরে আসে। পাড়ার মেয়েরা শালপাতায় সিঁদুরের মত একবিন্দু গুড় আর

একঘটি জল এনে তার উপোস ভাঙাতে চেষ্টা করে। ভাইকে ঘরে ফেরানোর উদ্দেশ্যে তার সাঙা করার ইচ্ছেকে কেউ কেউ বাঁকা ভাবে নেয়। পাদরী ফ্রান্সিসের আগমন। মাধালির জন্যে তারও অন্তর্হীন উদ্বেগ। একদিকে আত্মনিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত মাধালি। ভেবে ভেবে জেরবার। তার ভিতরে যে ভয়ঙ্কর কামজ্বরের উথালিপাথালি চলছে, তাকে ঠেকানোর জন্যে ভক্তিজ্বরের প্লাবন চাই। যেন 'বিল্লি আঁচড়ে' তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। ভাবোন্মাদে হাঁটতে হাঁটতে সে হুড়তির পথে এসে পড়ে। সেখানে অদ্বৈত মিশ্রর সঙ্গে দেখা। মিশ্রকে দেখে কুপিত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু তাকে হনন করতে গিয়ে উদম হারিয়ে ফেলে। কী করবে সে? সুবাইয়ের বাড়ির পথ না ধরে রোমনির গ্রাম রৈবতীর জন্য অন্য রাস্তা ধরে। আর তখনি মন বলে, 'যাই উয়াদের বাড়ী।' যেন' রোমনী তার হয়ে পড়েছে।' আর ঠিক এমন সময় টিলার উঠে আকন্দগাছ সরিয়ে তিনজোড়া উলঙ্গ আদিবাসী কিশোরকিশোরীর অদ্ভুত রমণদৃশ্য দেখে ফেলে সে। মাধালি একটু উঁচুলাফ দিয়ে মাটিতে পা ঠুকে তেড়ে যায়, 'হে হিরো! হি রে!' তারা ছুটে পালায়। এই দৃশ্য মাধালির রগে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে, 'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে সে নিজেই পাগল হবে, কারণ আকন্দ পাতায় তাদের ছবি আছে, কারণ কাঁকরে কাঁকরে কি যেন আছে, একটি মেয়ের ছোট সেগুনপাতার মত ছেঁড়া গামছাটুকরো, যা তার লজ্জাবাস ছিল, ঘুনসি থেকে খুলে পড়ে প্রকাণ্ড সাপের এক টুকরো খোলসের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাধালি কাপড়টা তুলতে গিয়ে, একটা লাথি মেরে, ঝাটিতি নেমে এল' (পৃ-১০৮)।

সুবাইয়ের বাড়িতে আসে মাধালি। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ বাতেলা চলে। পরাণ ঘাটোয়াল এসে মেশে তাদের সঙ্গে। তারপর পরাণ ও সে পথে বেরিয়ে পড়ে। কিছুটা পথ দুই বন্ধু একসঙ্গে আসার পর পরাণ ভিন্ন পথ ধরে। একলা মাধালি আবার বিকারের বশে চলে যায়। কর্সুডিহির মেয়ে রোমনির জন্যে তার প্রাণ মাথা কুটে মরে! 'মাধালির কোলে সেই দুরন্ত জঙ্গল, সেই ব্যাঙ, সেই শালিক, সেই ভ্রমর এমন কি কুমারী নদীর টিলার সেই কাপড় প্রত্যেকটা মানুষের মত বলছে কর্সুডিহি চল সেইখানে যে মেয়ের নিঃশ্বাসে চৈত্র মাস' (পৃ-১৯৯)। এতক্ষণ তার নিজের এই 'হার'কে মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু অদৃশ্য আগুনের হল্কায় কঠিন শীতল বরফ এবারে গলতে শুরু করেছে। যাবে কুমারী নদীর দিকে কিন্তু নেমে পড়ল পাথুড়ীর পথে। চলতে চলতে মূঢ় মানুষটি শেষে তার ভগবানেরই কাছে মিনতি জানায়, 'তাকে আমার সঙ্গী করে দাও—আমি বড় বন্ধুহীন গো ... ...!' ওদিকে পাথুড়ীর দক্ষিণে ঝরানি নদীর খাদ ধরে পাথর টপকে টপকে খেজুরছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে লুহানী শিশুর মত অশ্রুহীন কেঁদে কেঁদে চলেছে ভাই মাধালির খোঁজে। আর ঠিক তখন 'লুহানী হঠাৎ নিচু হতে হোল। সামলে, খেজুরছড়ি ফেলে দিয়ে হাতে জল তুলে চোখে মুখে দিলে, মুছবার সময় নেই, দেখলে কে একজনা লোক প্রকাণ্ড ঢালু পাথরে গুয়ে চারদিকে খৈ ছড়ান, পাখিতে খাচ্ছে। কি বলে সে ডাকবে— বলবে, 'হে মাধালি— মাধালি' বলে, এইটুকু পথ, পাথর ডিঙিয়ে এসে বললে, 'আমার দাদা গো ...' (পৃ-১২৩)। স্বজনের স্নেহস্পর্শে মাধালির মনের গভীরে নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে, 'ভগবান নাই; আর দেখব কাকে?' এই তার সত্য ও অন্তিম অনুভূতি। একটু পরে মাকড়ীর কথার উত্তরে সে, ভগবদ্দর্শী যীশুর মহাভক্ত মাধালি, নিজের ভিতরকার চাপা ঐবিক ক্ষুধার সশব্দ স্বীকৃতি দিয়ে ওঠে,

'আমার শালা মেঘ ডাকলে কাম হয়, আমার শালা ব্যাঙে পোকা ধরলে হয়, ভাবলাম শালা আমিও কোথাও পোকার মত ভয় পেলে হয়, আমি মাগী চাই এ কেনে বল ....' (পৃ-১৩৪)। এই স্বীকৃতির পরিণামে মুক্ত সহজ মানুষ হয়ে যেতে পারে মাধালি। চিরশত্রু মহাঘৃণা কুষ্ঠপচা অদ্বৈত মিশ্রকে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করে। প্রেমের এও এক অবিকার আচরণ। এখন তো আর কোন পর্দা রইল না। এখন শুধু রকেটের গতিতে উন্মুক্ত অভিসার—ভনডহর পেরিয়ে—হুড়তির পথে ছুটে চলা। 'খরপায়ে চৈতী হাওয়ার মতই' রৈবতীতে এসে পৌঁছে যায় মাধালি। সেখানে শালবাগানের আড়ালে ঘরের দরজায় সেই মেয়ে, রোমনি, দাঁড়িয়ে ... ... 'সকালের রোদে মুখখানি তার অজস্র ফোয়ারার মত আঁধে দেহের সৌন্দর্য ... ... এলোচুল হাওয়ায় উড়ছিল ... ... আর ডাগর চোখে ছিল তার ভয় ... ... বিস্ময় ... ... আরো তদূর্দ্ধের কিছু' দয়িতা রোমনিকে দেখে প্রেমার্ত মাধালির মনোদেশ: 'অন্ধকারের এক মেঠো রাতের মহুয়া-মাতাল মাধালি ধানক্ষেতের অগণন গোপনতাকে যে হিমতীক্ষ্ম রোমাঞ্চিত করেছিল, পলাশকে যে রঙিন করেছিল, ঝড় তুফান হয়ত বা বজ্র হানতেও সে চেয়েছিল কিন্তু এখন তার গা বৃষ্টিভেজা এমত মনে হয়েছিল' (পৃ-১৩৬)।

সব পথ হেঁটে এসে শেষে মাধালির একান্ত প্রতীতি হয়, 'তার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে এই মেয়েটিই পারে এবং এই জোরেই সে হয়ত আলোর পথে যেতে পারত ... ...।' কী নিবিড় পার্গেশন, কী গভীর আর মধুর মাধালি-রোমনির মিলনকথা! 'মাধালির ভেতরের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রক্তটা আবার কিসের উষ্ণতায় কম্পমান হয়ে উঠল, সে একদৃষ্টে রোমনিকে দেখছিল। রোমনির ডাগর চোখে আজ মাধালি তার আপনকার ছায়াটা স্পষ্ট দেখেছিল, যে ছায়ায় ... সাগরের গভীরতা ... ... আকাশ নেমে আসে ... ... মাটিকে দেয় আরো সবুজতা! ফলে মাধালি ভীত, সে জড়সড় সে হয় বিমূঢ়' (পৃ-১৩৬)। অসংস্কৃত আদিবাসীজীবনের যৌন সংকটের জটিলতা ও তার প্রশমনের বর্ণনাচিত্র যেমন ক্লাসিক তেমনি হার্দ।

এই আদিবাসীজীবনের অন্ত্যজ ও আঞ্চলিক যাপনের একেবারে তৃণমূল অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কমলকুমার মজুমদার। আর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সমারোহ সারা উপন্যাস জুড়ে! 'খাওয়াদাওয়ার পর যে যার পাতা খুলে সদর দরজার বাইরে ফেলে হাতমুখ ধুয়ে' নেয়। কেউ এসে পারকোমে বসে পানের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। আর রোমনিকে যে তখন হেঁসেল ঠেলে রেখে এঁটো জায়গায় জলের ছিটে দিয়ে ন্যাতা দিয়ে মুছে নিতে হয়, সে আচারটুকুও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না। পাথরের উপর হরীতকী রেখে পাথর দিয়ে ভাঙা, তারও বর্ণনা পাই। আগেই বলেছি, মাড়ভাত, ভুট্টাদানা, খৈ, গুড় এদের প্রিয় খাদ্য। আর বাসি পচাভাত তো পরমান্ন। সেই সঙ্গে একটু নুন আর সরিষার খৈল যদি জোটে তো সোনায় সোহাগা। আরো যদি কোন প্রিয় পড়শীর বদান্যতায় কাঁচাপোড়া পায়রাসিদ্ধ মিলে যায়, তবে তো সে এক মচ্ছব। এদের অন্য প্রিয় খাদ্য কাঁঠালের বীচি। এদের অতিথি আপ্যায়নও বড় ছিমছাম: শালপাতার উপর সিঁদুরফোঁটার মত একটুখানি গুড়, কালো তিল, মৌরি আর একঘটি খাবার জল। সন্তান হলে মাকে নৈবেদ্য দেয় 'হুক্কী' ও বেলগুটি খয়ের।' আর এদের প্রিয় নেশার বস্তু হল মৌ আওলা। সাঙা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিয়েতে বেশ কষ্ট এদের। কেননা পুরুষমানুষকে ঘর বেঁধেই বড় 'হাড়' কিনতে হয় এবং সেই

ভারী বোঝা হাট থেকে মাথায় করে বয়ে আনতে হয়। যদিও খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তারা এখন পোশাকী ভাবে আধুনিক, তবু কুসংস্কারের প্রভাবে লোকধর্মের প্রতি পিছুটান রয়ে গেছে আজো: 'চল লুকিয়ে আমরা জহরথানে একটা সাদা মুরগী দি, কিস্তান আমরা তাতে কি, কেউ জানবে না' (পৃ-৫৮)। এই আদিবাসীদের জীবন অদ্যাবধি তিমিরাচ্ছন্ন; সতত অনিকেত ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত। বারোমেসে দুঃখে তাই কান্নারও অনটন। মাধালির জবানীতে লেখক জানান, 'ইয়ারা কান্না কুথাকে পাবে— ইয়াদের জীবনটাই তো কান্না হে' (পৃ-১৩২)। এ সমাজে বন্ধুপাতানোর রীতিও বেশ মর্মস্পর্শী: 'শিয়ারল পাহাড়ের মধ্যে যে কাল পাথর আছে তাই ছুঁয়ে, কুমারী নদী ছুঁয়ে, জঙ্গলের দুপাশ থেকে দুজনে ডেকে বন্ধুত্ব,' (ঐ, পৃ-১১৮)।

আদিবাসীদের এই জীবনচিত্রণে কমলকুমারের অভিজ্ঞতা যে কত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ স্পর্শজাত, তার প্রমাণ মেলে উপন্যাসের মধ্যে যখন তখন এদের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষার অবাধ ব্যবহার। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক: 'হানি লেলয়াইএগা ইকুয়ামাত্র' ('ধান কাটতে কাস্তেতে আঙুল কাটায় আমি রক্ত চুষিছি গো, নিজের রক্ত') (পৃ-৫৭): 'মার নেকাদো আবানপে' (পৃ-৬৮)। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী পাঠকদের সুবিধের জন্য ফুটনোটে অনেক দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দের বাংলা অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। 'শবরীমঙ্গলে' অতটা উদারতা দেখি না কমলকুমারের। নানা প্রসঙ্গে তিনি এবং তাঁর চরিত্ররা যে অসংখ্য আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছে, তার একটা সাধারণ তালিকা দেয়া যেতে পারে: আনসঙ্গরা, কাঁটাহরের বীচি, কাঁড়ার ঘণ্টা, ঘুসকী, চুটা, ছাতি (ব্যাঙের ছাতা), ডোল, ঠেঁটি, ঠেন, পারকোম, পোকা, ধৌরী, তেল, বুন্দাই, মাছিড়া, মৌ আঁওলা, রাঢ়, রেড়ী গাছ, স্যাঙা, হোড়, খোলা ইত্যাদি। বহুবিদ্যায় বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ কমলকুমার এই উপন্যাসেও তাঁর বিচিত্র পুঁজি মেলে ধরেছেন। লোকশিল্প সম্বন্ধে তাঁর শৈল্পিক মন্তব্য: 'লোকশিল্প ঠিক তাই, কোথাও ফ্রেম নেই— নেই ... ... মধ্য হতে সে ধরে আছে, আলো অন্ধকারের বিচার সে জানে না' (পৃ-৫৫)। আঞ্চলিক শব্দের যে তালিকা উপরে দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে, উপন্যাসে যে সব একেবারে স্বকীয় শব্দ বাগ্‌ধারার ছড়াছড়ি ঘটিয়েছেন লেখক, তার তালিকা তৈরি করতে গেলে। বাংলা কথাসাহিত্যে যে সব প্রতিভাধর গুণী লেখক সেই টেকচাঁদ-হুতোমের যুগ থেকেই মামুলি মানুষের একেবারে মুখের ভাষাকে লিখিত ভাবে আমদানি করে আমাদের চমকে দিয়েছেন, তাঁদেরকেও ডিঙিয়ে অনেক এগিয়ে এসেছেন কমলকুমার। শুধু তাই নয়, ওঁরা যেখানে মাত্র ব্যাচ্যার্থে হৃষ্ট, কমলকুমার সেখানে ধারণাতীত অন্বয়ের সাহায্যে সম্পূর্ণ নতুন শব্দের বা শব্দমালার, কখনো বা অশ্রুতপূর্ব বাকপ্রবাহের জন্ম দেন। তাঁর এই বাকশিল্প বাহ্যত প্রাকৃত ও লোকজ, আসলে অতি সূক্ষ্ম ও সচেতন এক মৌলিক শিল্পনির্মিত। উপস্থিতমত এদেরও একটা তালিকা দেয়া যাক: 'ডাগর বুকটা', 'আদছায়া' (পৃ-৯), 'ক্ষুদখাগী' (পৃ-১০), 'বেহুড়লে' (পৃ-১২), 'লোকলোকুচ'(পৃ-১৪), 'হাঁটুরে হাসি' (পৃ-২৪), 'বাঘ-ডাক ঢেকুর', 'দমসাম', 'দেহমন ইলিবিলি করে', 'ছোচা কোটা আবহাওয়া', 'পাহাড়ঠাঁই-কুট লায়গা', 'মনপোষানি জানে না' (পৃ-৪০), 'বুকপোড়া বাক', 'লায়েক ধান' (পৃ-৪২), 'কষ্টের ডহর' (পৃ-৪৪), 'ছোকরা ধানক্ষেত' (পৃ-৪৫), 'দুলাড় ধান'(পৃ-৪৬), 'চার্চের দেবতা ডাগর জগত' (পৃ-৫০), 'মোরগ-ডাকা ভোরের সাদৃতা' (পৃ-৫৯), 'বিদ-দিরির

মত খাড়া', 'পায়ের ফাসা' (পৃ-৬১), 'ফুলমালার অমরতা' ৯(পৃ-৩০), 'পাখোয়াজ ছেলে' (পৃ-১২৮), 'বেপট পাখি' (পৃ-৬৬) ইত্যাদি।

শুধু শব্দবন্ধ নয়, লেখক তাঁর মৌলিক মেধাযোগে এ ধরনের স্বকীয় বাকবন্ধও সৃষ্টি করে যান অনর্গল। যখন জটার সান্নিধ্যে আসে রোমনি, তখন সে 'আহ্লাদে পঞ্চমে অস্তিশূল হয়ে গেল' (শ.ম, পৃ-২৬)। বিশেষ একটি মুহূর্তে ঘনিয়ে ওঠা রোমনির দেহরহস্যের বর্ণনা: 'তার দেহের ভাঁজে এখন চোখের রক্তিমতা রয়েছে' (শ.ম, পৃ-২৬)। রোমনির হৃদয়তাপের মুখোমুখি মাধালি নিঃসাড়, প্রতিক্রিয়ায় রোমনি প্রকাশ্যে নিস্তেজ অথচ ভিতরে পুলকোন্মুখ। তার এই সুপ্তশিহরণের বর্ণনা: 'সে স্থবির হয়েছিল সে প্রাচীন হয়ে গেল। তবুও দেহ নৃত্যভঙ্গীতে শিথিল' (শ.ম, পৃ-৩০)। মাধালির চোখে, ফুলমালায় ও ভাতের সৌরভে পুঞ্জিত আবহ, যা রোমনির গৃহমধ্যকার আবহে সৌখিনতার ইংগিতবাহী, লেখক তাকে তবলাবাদ্যের একটি বিশেষ কেরামতির সঙ্গে তুলনা করেন: 'একটু শব্দে তবলা তার নিজস্ব শব্দেই রেশ রাখে' (শ.ম,পৃ-৩০)।

ভারতীয় সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' আপ্তবাক্যটি ক্লিশে, অথচ অক্ষয়। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি জীবনানন্দ দাশ তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপমাসম্রাট। কিন্তু কে জানতো, পাদপ্রদীপের অন্তরালে আলাদা জাতের এক সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক উপমাচক্রবর্তী নিঃশব্দ প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত? আমি, বলা বাহুল্য; কমলকুমার মজুমদারের উপমাশিল্পের বিষয়ে বলছি। সে উপমার কুলজি একেবারেই অপ্রচলিত ও অচিন্তিতপূর্ব। আর এই বিশেষ অলংকারের ব্যবহারে তিনি যথেচ্ছ প্রশ্রয়ী। এখানেও তাঁর স্বকীয় উদ্ভাবন ও রুচিচিহ্ন বিস্ময়কর। আদিপর্বের এই উপন্যাস 'শববরীমঙ্গলে'ও এ জাতীয় উপমাউৎপ্রেক্ষা অঢেল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। উদাহরণের পালায় আসা যাক।

মাধালির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শুঁকেটুকে মুখখানা বাঁকিয়ে অনুরাগিনী রোমনি ফোড়ন কাটে, 'ইঃ! গায়ে কি পাতা পোড়া গোন্দ হে—লাও চান করগা—' (শ.ম,পৃ-৯)। 'বজ্জাত ধ্যাষ্টা' সাঁওতালী মেয়ের চপলতা যেন 'লতা আটকানো শিং, অনবরত মাথা নাড়া দেয়' (শ.ম, পৃ-১৪)। রোমনির হাসিতে প্রত্যাশিত রসিকতার অভাবকে লেখক বর্ণনা করেন, 'হাসিতে তার হরিণ-খুরো আওয়াজ হল না' (পৃ-২০)। ছাতু আর মাছযোগে সুস্বাদু ভর্তাকে মনে হবে খুব 'পোয়াতিপসন্দ' (পৃ-২০)। বাঁধে বহমান 'ভ্রমর-গতি হওয়া' (পৃ-২১)। রোমনির মনটি ভাতের মত নরম (পৃ-৩৩)। স্নান ও অন্নের তৃপ্তিতে পারকোমে বসে থাকা জটার চেহারাটির 'বর্ষাস্নাত বৃক্ষের মতই খোলতাই হয়েছে'(পৃ-৩৩)। শিশুকে স্তন দানরতা মায়ের গর্ব স্ফীতবক্ষা পায়রার মত। নিবিড় নিদ্রারত মাধালির প্রতি রোমনির রগুড়ে মন্তব্য, 'কি পাকা কাঁঠালে ঘুম ঘুমাইছে বটে লোকটা'(পৃ-৩৪)। পারকোমের তলা থেকে অতি লোভনীয় মদ মৌ আঁওলার বোতল বের করে বেসামাল মাধালির মনে হয়, 'বড়লোকের গা ছোঁয়া যেমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার তেমনি' (পৃ-৩৭)। আর একচুমুকে আধবোতল মদ গেলার মত 'পাহাড়ী' কাণ্ড করার পর মাধালির দশাসই চেহারা দেখে সন্ত্রস্ত অদ্বৈত মিশ্রের মনে হয়, লোকটা যেন শুঁড় তোলা হাতি (পৃ-৩৮)। হেথা হোথা বিক্ষিপ্ত জোনাকীর আলোকে মনে হয় যেন 'টাকা-ভোর উজ্জ্বলতা' (পৃ-৪০)। 'ধুনুরী পাখমারা ছিপের আঠায় বটের যেমন ঝটপট করে' (পৃ-৪৬), তেমনি চিত্তচাঞ্চল্য মাধালির।

চার্চের সামনে পৌঁছে বিহ্বল মাধালি 'শূয়ার যেমন নাকমুখ তাগিয়ে বোকার মত চেয়ে থাকে তেমনি চেয়ে রইল' (পৃ-৫০)। শবরীকন্যার বুড়ো বাপের সারা দেহে চার্চের অন্ধকার 'ব্যাঙের মত গা ভাসিয়ে দিয়ে আছে' (পৃ-৫১)। আর 'বুরখা বুরখা' (বর্ষা) চোখ শবরী মেয়েটির ঈশ্বরদর্শনের কথা মনে হতেই মাধালির গায়ের শিরা গরুতে খাওয়া ঘাসের মত তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে (পৃ-৫৮)। 'পায়রার মত আকাশটা' (পৃ-৮১)। লুহানীর মুখে সাঙা করার প্রতিজ্ঞা শুনে পুরুষগুলো ভিতরে ভিতরে 'বড়া ভাজার মত' উলটপালট খেতে লাগে। (পৃ-৮৯)। লুহানীর জিভটি 'পায়রা-পা রঙের' মত, ঠোঁটটি 'শিমফুলের মত' (পৃ-৯২)। লুহানীর প্রতি রুষ্ট পুরুষের কথার তোড় যেন 'বন থেকে বুনো মহিষের মত বার হয়ে এল, কার ধানক্ষেত, কার ভুট্টা এসব জানে না চিনে না'. (পৃ-৯৩)। বনে বনে ঘুরে লুহানীর তেলজলবর্জিত চুলগুলো হয়েছে 'গোদা চিলের ডানার মত' (পৃ-৯৮)। মাধালির বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে থাকাকে লেখক বর্ণনা করেন, 'মহিষ যখন তার শিঙে লতাপাতা জড়িয়ে যায়, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলে আর নিচু মাথা থেকে উপর দিকে চেয়ে থাকে। আবার একটু তার দিকে চাইলেই পাহাড়ের মত দূরে দূরে যায়' (পৃ-৯৮)। রোমনির প্রতি নিষিদ্ধ প্রেমে রক্তাক্ত মাধালি যেন 'বিল্লি আঁচড়ে' (পৃ-৯৯) ক্ষতবিক্ষত। মাধালির চোখের সামনে 'জিবের মত সাদাটে লাল রাস্তা' (পৃ-১০৪) এবং শালগাছের 'ছাতাটি যেন 'একটা স্বরবর্ণের মত' (পৃ-ঐ)। মাধালির জন্যে বদ্ধ পরাণ ঘাটোয়ালের মনোব্যথা সদোকাটা মুরগীর পেটে ডিম দেখার দৃশ্যের মত (পৃ-১১৮)। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর লুহানী ও মাধালি কবরস্থানে ক্রন্দনরতা এক বুড়ির কাছে আসে, সে বুড়ি ভিতরে ভিতরে আচারের মত পচছে (পৃ-১২৬)। অদ্বৈত মিশ্রর চোখে রোমনির রূপ: 'ধোঁয়া যেমত বা হঠাৎ উঠে সমতল হয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে যায় তেমনি রোমনির দেহ এবং হাঁসের মত বাঁকা ঘাড়ের শেষে মুখমণ্ডল' (পৃ-২৫)। রোমনির মধ্যে অদ্বৈত মিশ্র আজ নতুনত্বের লক্ষণ আবিষ্কার করে! 'নতুন বটপাতার মত বিস্ময়কর, সন্ধ্যার গেরিমাটির মত রঙ' (পৃ-২৫)। কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা গ্রামের ধোঁয়া যেন 'হাতে গড়া মাটির পুতুলের মত, ইঙ্গিত আছে, কিন্তু স্পষ্টতা নেই' (পৃ-৪৯)। পথ 'মই দেওয়া রাস্তার মত নরম', পায়ের তলায় স্থির জলের মত আর চলতি পা যেন শুষ্ক পাতা (পৃ-১০৩)। নদীর উচ্ছল জলধারার যে বর্ণনা দেন লেখক, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার: 'যতবারই স্রোতের দিকে তাকিয়েছে মনে হয়েছে সোমত্ত গাভী যেমন সৌরভার চরানির মাঠে পাথরের উপর রোদ পড়লে দেখে লাফালাফি করে, অস্থির হয়, ন্যাজ তুলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে গুঁতোয় তেমন এই জলরাশি' (পৃ-১০৪)। ঝরানি (ঝরনা)-র কাছে এসে লুহানী স্থির হয়ে যায়, যেমন জলপানরত সাপ দেখে নিভে যাওয়া প্রদীপের মত চুপ হয়ে যায় মানুষ (পৃ-১২২)। মাধালির হাতের মুঠোয় ধরে রাখা গিরিমাটিগুলো মুরগীর ছানার মত 'দিপদিপ' করে (পৃ-১২৫)।

লেখকের স্বকীয় বাকরীতির আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রোমনির এলাকার ভারী হাওয়াকে মাধালির মনে হয় 'অত্যন্ত পাথর' (পৃ-১১), ক্রীড়ারত শিশুকে বলা হয়েছে 'উলঙ্গ বর্তমান' (পৃ-৪০), সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছে চতুর্দিক 'স্তব্ধ'। সুচানীর দেহে যৌবনসঞ্চার অপূর্ব বর্ণনা: 'যে মত ঐ সুচানীর যখন বয়স হল, তখন রোধাকার এক পাড়াতু তার দেহের মধ্যে আশ্রয় করেছিল, উদ্ভিন্নযৌবনা সুচানী তার পিঠে বুকে সমান যৌবন ছিল, সে গাছের

কাছে গেলে গাছ পর্যন্ত রোগা হয়ে যেত' (পৃ-৯৬)। আদিবাসীদের জীবনে ধর্মের রিচুয়াল সংক্রমণের বর্ণনা: 'মন্দির আর ভগবান ছোট জাতের কাছে বীজানুর মত' (পৃ-১৩১)।

এমন কি নরনারীর আচরণ প্রক্রিয়ায় যেখানে দেহভঙ্গির বিশেষ বিশেষ বিন্যাস মূর্ত হয়ে ওঠে, সেখানেও কমলকুমারের বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। 'তুমি কে বট হে রোমনির' — মাধালিকে এই প্রশ্নঘাতের তৃপ্তিতে অদ্বৈত মিশ্র 'পণ্ডিতের মত কাশতে কাশতে ছাতার হাতলটা তেমনি বাজাতে লাগল' (পৃ-১০)। অনন্তর সে তার বাবু হয়ে বসা হাঁটুদুটি 'ঘানি ঘোরা' ঘুরিয়ে বসে (পৃ—২২)। ডাক্তার অসভ্য ভাবে একলাফে আড়মোড়া ভাঙার ক্রিয়াটি 'উর্ধ্বে তীর ছোঁড়ার মত' (পৃ-৩৫)। উপন্যাসের চরিত্ররা কথার উত্তেজনায় উরুতে চাপড় মারে। লৈবী বাঁদরের মত হাত উল্টিয়ে পাঁজর চুলকোতে থাকে (পৃ-৭০)। রোমনিকে ভজানোর জন্যে পুরুষেরা কেউ কেউ উরুতে তেল মাখিয়ে তার নজর কাড়ার চেষ্টা করে (পৃ-৯৮)।

এবারে যে অসাধারণ সুন্দর সমৃদ্ধ ভাষাশিল্প দিয়ে 'শবরীমঙ্গলে'র শরীরটি সাজিয়েছেন কমলকুমার, তার কিছু পরিচয়ে আসা যাক। মাধালির মনের কথাটি জানবার জন্যে অধীর রোমনির মনের যে অবস্থা, 'সেখানে যেন জল নেই ডেভা নেই। পাতার মর্মরের জন্য কোন বায়ু সঞ্চালিত হয় না, এমন কি ডানার জন্য কোন শূন্যতাও নেই বাতাসে' (পৃ-২৩)। মাধালির প্রেমে বিভোর রোমনির রোমান্টিক কল্পনাবিলাস: 'হয়ত আশাও করেছিল ঘর থেকে বার হবার সময় মাধালি তার আঁচল ধরবে আর সে সেই পিছুটানে সমস্ত পৃথিবীটাকে আপন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জীবন দান করবে। এমন কি স্রোত হয়ে দেখা দেবে এমন কি ডানাকে সঙ্গীহীন আকাশে নিয়ে যাবে, কিন্তু নীল এনে মাটিকে আরও সবুজ করবে, আর তারার খবর এনে কল্পনাবিলাসী করে দেবে। মাধালি যেন জড় হয়ে আছে' (পৃ-২৪)। রোমানির সান্নিধ্যে মাধালি ফসলগরবী সেই জমির মত জীবন চায়, 'যে জমিতে ... ... শালিয়ানা ধান হয়, যে রাস্তা দিয়ে ধান যায়, যে মরাইয়ে আড়াতে ধান ওঠে সেই জীবন চাই ... এর জন্যে আমি পাপ করতে প্রস্তুত' (পৃ-৩০)। পাথরের পাত্রে মৌ আঁওলা ঢালা হলে সেখানে 'খানিকটা বেগুনী তরল চঞ্চলতা'র কম্পন চলতে থাকে (পৃ-৩৮)। রোমনির উৎসর্গে মাধালির কাল্পনিক আত্মনিবেদনের আর্তি কী কাব্যময় আন্তরিক; 'একবার মনে হল সমস্ত কিছু সে তার দুহাতের আঁজলায় ভরে যত সবুজতা আছে: যত রুক্ষ টিলা আছে, যত শুদ্ধতা, সকল কিছুকে নিয়ে ঊর্ধ্বে কাউকে উদ্দেশ করে অর্ঘ্য দিতে পারে' (পৃ-৪৩)। মাধালির চোখের সামনে উদ্ভাসিত তুড়সীর পিঠের অপূর্ব নান্দনিক বর্ণনা: 'মেরুদণ্ডের হাড় ঘৃতকুমারীর পাতার মতই বেঁকে উঠে গেছে, আর দুপাশে অপর্যাপ্ত দুধ, এক ফালি ঝাপড়ের উপর পল্কা ঘাড়, তাও যেন ভেঙে পড়বে' (পৃ-৪৪)। বাংলা সাহিত্যে নারীদেহের বর্ণনায় প্রচলিত আদিখ্যেতা ও ন্যাকামো থেকে এই চিত্রণ কত স্বতন্ত্র! অরণ্যের মধ্যে বিভ্রান্ত মাধালি চার্চের সামনে এসে পড়ে আরো দিশেহারা। তার অপ্রকৃতিস্থ চোখে দেখা অন্ধকারের (শরৎচন্দ্রের 'অন্ধকার' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র) বাতিক্রমী বর্ণনা: 'দূরে বটে ক্লীব অন্ধকার বসে আছে, আবহাওয়া ইতস্তত নড়ছে' (পৃ-৪৭)। এর পর কমলকুমারীয় ভাষায় সে নিজেই এই অন্ধকারের চরিত্র শনাক্ত করে নেয়, 'বাদুড় কি সমস্ত অন্ধকার আকাশ থেকে আমাদের উপর ফেলেছে, কি ভয়ঙ্কর আঠা আঠা অন্ধকার! সাপের দাঁত যা খুঁয়ে নিতে পারলে না, বাঘের নখে

যে আন্ধার নিলে না, ডিম থেকে শুরু করে উড়া থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত শুঁয়েও এ আঁধার অনড়'— (পৃ-৪৭)। এই উপন্যাসে অন্তত আরো দুজায়গায় অন্ধকারের এ রকম অননাধর্মী বর্ণনা মেলে। ৬৬ পৃষ্ঠায় লেখক 'অন্ধকার পোড়ার আওয়াজ' শুনিয়েছেন তাঁর পাঠকদেরকে। রাতের অন্ধকারের কৃষ্ণত্ব আমরা অনেক জেনেছি বাংলা সাহিত্যের গুণী লেখকদের কাছ থেকে। কিন্তু কমলকুমার গুণীজনের মধ্যেও গুণিন। অন্ধকার তাঁর বর্ণনায় এ রকম: 'এই অন্ধকার এক অন্ধকারের কালো। যে কালোর মধ্যে সমস্ত শিশিরে যে নম্রতা ছিল তা প্রান্তের বিস্ময়ের থেকে আরম্ভ করে অগণিত তারার বিদ্রূপ ছিল' (পৃ-৭৯)। আদিবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে চার্চ ও পাদরীর সম্পৃক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এক দীর্ঘ ক্লাসিক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে উদ্ভীয়মান হংসের মত ব্যবধান আমার সঙ্গে; দূরবিসর্পী চিলের ডাক যেমত মাটিধৃত বস্তুর মত হয়ে আসে, দূরত্ব তীক্ষ্ণ হয়, তেমনি হিমতীক্ষ্ণ হয়ে আসে এদের নড়াচড়া। মধ্যরাতে আমার কাছে তাদের গোপনতা এনে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলায় আমি রোমাঞ্চিত, আর আমি তাঁকে ডাকি। এই অগণন ত্বকের উপরের গোপনতা। কোথাও তুমি কুড়লে হাতের ভর দিয়ে শ্রান্ত, কোথাও তুমি ঝড়ে পাখীর-বাসা-পড়ে-যাওয়া দেখতে ব্যাপৃত, কোথাও তুমি নবাগত উৎফুল্ল স্রোতা পাতা ফেলে দিয়ে অবাক হয়ে থাক, হে গোপনতা! কত গাছ সুদীর্ঘ হয়েছে, বিশুদ্ধ পলাশ কোথাও, কোথাও জলকে রঙিন করেছে, কিন্তু তুমি তোমার পূর্বপুরুষ ঘাড়ে করে অক্লান্তভাবে চলেছ। জীবনকে ফেলে নিয়ে বনাঞ্চল অতিক্রম করেছ, এই তোমার কাজ, বহুবারই আকাশের দিকে চেয়েছ। শোন তোমার দৃষ্টিকে নিপীড়িত করেনি, এখন তুমি উপলব্ধির জন্য বসে আছ তোমারই তারা যারা .... প্রভুর নাম শুনে তাঁকে দেখতে বেরিয়েছি। যারা তাঁর ক্রুশবিদ্ধ খবর জানে না, আজও যাঁকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন খোজাই আছে, শুধুই তোমরা খুঁজছ' (পৃ-৫৪)। বইয়ের চাতালে আগন্তুক মানুষগুলোর নিঃশব্দ আগমনের ক্লোজশট বর্ণনা: 'তারা কি অদ্ভুতভাবে আসছে, মুখে যেন হাত ঢাকা দিয়ে, ইদুঁর ফোকর দিয়ে মুখ যেমত বার করে, দেওয়াল ঘেঁসে একজনাকে অতি সন্তর্পনে ডিঙি মেরে মেরে ঢুকে পড়ল, ক্রমাগত হাতটা নিজের কাপড়ে মুছছিল, একে একটি লোকের মধ্যে নিজের কুমড়োর উপরে এক পা রেখে, বুকের উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভারিক্কী চালের কথাবার্তা বলে বহুলোক তার কাছে আচল পয়সা দেখাতে আসছে, সে এখন ইদুঁরের মত দেওয়াল ধরে এসেছে। তারপরই আর একটি মুখ গাছের ছালের মত ফাটা ফাটা শরীর বেঁকে গেছে জীবনটা বয়ে বয়ে। একহাত দরজায় দিয়ে, দেহকম্পনে ঝিঁঝির ডাক বেশ স্পষ্ট। শুধু মুখটা ছাগলের মত নড়ছে; আর কটর কটর করে শব্দ একটা পাখীর মত। শব্দগুলো লাল পিপড়ের মত গায়ে এসে পড়ছে আর সে যেন গা থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। ছাগলের মত বুড়ী মুখের উপর অনবরত সেজের আলো ভাঁজ হয় আবার খুলে যায়' (পৃ-৫০)। যৌনতা সমরেশ বসুর বেলায় যতটা অবসেসন, কমলকুমারের ক্ষেত্রে অতটা লাগাতার এঁটুলি না হলেও এটা তাঁর একটা অতিঅভ্যস্ত স্যাডো-গং। সেনসুয়াল রঙ্গপ্রসঙ্গে তাঁর কলম তুলির অধিক বর্ণাঢ্য। অথচ 'শবরীমঙ্গলে' এ রকম একটা রগরগে সিকোয়েন্সের সুযোগকে অত্যাশ্চর্য শালীন শিল্পমনীষায় মুড়ে দিয়েছেন। উপন্যাসিক। রোমনির গ্রাম বৈরবাঁতে যাওয়ার পথিমধ্যে শালবাগানের ফাঁকে আদিবাসী বালকবালিকাদের সঙ্গমক্রিয়ার সাটল বর্ণনার

ভাষা: 'আর জনাতিনেক মেয়ে জনাতিনেক ছেলের মাটিতে পাছা, এখান থেকে দেখা যায়, এখন এরা খেলায় মত্ত, মূর্খতাও ছিল' (পৃ-১০৮)। সবুজ নিসর্গপটে অসমাপ্ত সঙ্গমলীলার লেশচিহ্ন: 'আকন্দ পাতায় তাদের ছবি আছে কারণ ছোট সেগুনপাতার মত গামছার টুকরো, যা তার লজ্জাবাস ছিল, ঘুনসি থেকে খুলে পড়ে প্রকাণ্ড সাপের এক টুকরো খোলসের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল' (শ.ম, পৃ-১০৮)।

সাঁওতালী মেয়েকে পিছু ধাওয়া করে পলাশতলায় পেড়ে ফেলে গয়ালী পাণ্ডার বলাৎকার দৃশ্য বর্ণনায়ও লেখক মিতবাক ও সংযম (পৃ-১২১)। মাধালিদর্শনে রোমনির রোমাঞ্চনা, মাধালিরই কঙ্কালত্বে: 'প্রজাপতির ডানার মত তার দেহটা খুলে যাবে' (পৃ-১২০)। শোকাকুলা বোন লুহানীকে পাড়ার দরদী লোকেরা তার ঘরছোড়া ভাই মাধালির ফিরে আসার আশ্বাস শোনায় রূপক ভাষায়: 'মাদল ছেড়ে শব্দ কখন যায় না।' (ঐ পৃ-১২২)। এ রকম রূপক ভাষার ব্যবহার পাদরীর হাতের বর্ণনাতেও, 'লোকে বলে পাদরীর হাত ভোরের হাওয়ার ঘর' (ঐ, পৃ-১২৩)। এদের লোকায়ত বিশ্বাসে রামধনুর জন্মের বর্ণনাটিও ভারী সুন্দর: সূর্য পৃথিবীকে বড় ভালবাসে, একটু একটু সে তার মধ্যে লুকোচ্ছে, সেই আলোগুলোই বর্ষার রামধনু রঙ ধরে বার হয়ে আসে ..... ' (ঐ, পৃ-১২৫)। লুহানীর চিত্তশূন্যতা, 'সে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ, একমাত্র শুদ্ধ স্বর বেড়ে উঠে ক্রমে লুপ্ত হল' (ঐ, পৃ-১২৬)। প্রত্যূষের অভ্যুদয়ের মনোরম বর্ণনা: 'মহিষের পিঠ থেকে সকাল আকাশে উঠে গেল, সুচের পিছনে সুতার দৈর্ঘ্য বনানীর সূক্ষ্মতা রয়ে গেল।' (ঐ, পৃ-১২৬)। দারিদ্র্য ও পাপের অসহাবস্থান সম্বন্ধে মাধালির ভূয়োদর্শন: '... ... যে হাঁড়িতে চাল নাই সে হাঁড়িতে পাপ আসে না, ছেঁড়া লোকের মধ্যে পাপ ঢুকে না ...' (ঐ, পৃ-১৩৩)।

ডিটেইলের কাজে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান লেখকরা কমবেশি প্রত্যেকে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফাঁকে ফাঁকে বুদ্ধিবৃত্তির উইটের চকিত উদ্ভাসে তাঁরা আমাদের চমকিত করে দেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কমলকুমারের মাইক্রোস্কোপির অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর এক্স-রে দৃষ্টি অস্থি ভেদ করে মজ্জার গভীরে চলে যায়। হালে দেবেশ রায় তাঁর 'বৃত্তান্ত'-পর্বের উপন্যাসগুলোতে এই বিশেষ নিরীক্ষাটির সুদক্ষ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবে দেবেশ রায় যেখানে চরিত্র ও লক্ষ্যগত দিক দিয়ে জঙ্গম, কমলকুমার সেখানে স্বভাবতই কণ্ডুয়নবিলাসী। পাঠক ক্লান্ত হয়ে গেলেও তিনি অক্লান্ত। হয়ত, ঢোকরা শিল্পের একটি রেখা অথবা উড়ন্ত রুমালের অধোমুখী গতিভঙ্গিমা কিংবা হাভাতে জনযূথের চরণক্ষেপের কারুকার্য; দানার পর দানা মশলার মেশাল দিয়ে দিয়ে দাবা খেলোয়াড়ী নিষ্কম্প নিরুদ্বেগ অধ্যবসায়ে একটি প্রত্যঙ্গাংশের প্রতিমা গড়ে তোলেন। তাঁর এই দুর্লভ প্রতিভার নিদর্শন আদিপর্বের উপন্যাসের সূচনাস্থল রোমনির গৃহবর্ণনা। সেখানে আবির্ভূত বয়স্ক অদ্বৈত মিশ্রকে মাধালির চোখ দিয়ে লেখক এঁকেছেন: 'মাধালি মাথাটা তুলে দেখল ছিটকানো আঙ্গুলওয়ালা—বাঁকা পায়ের—দুটি পায়ের পাতা। লাল পেড়ে ধুতি, গায়ে তালিমারা একটি কোট—বগলে রোদবৃষ্টি সওয়া একটি ছাতা, উপরে আদলায় সন্তুষ্ট একটি মুখ' (ঐ, পৃ-১০)। লেখকের দৃষ্টিতে পাহাড়ী হাওয়ার লীলাপ্রবাহ এভাবে ধরা পড়ে: 'এখন ছোট ছোট দূর-কানাই শহর পাহাড়ে চোট খাওয়া হাওয়া আসছে, এ মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় উঁচুতে উঠে: ধানগাছে খেলা করে, পাতা উড়ে, রোমনি হাওয়া অনুভব করলে' (ঐ,

পৃ-২৬)। মাধালির উত্তর শোনার জন্যে রোমনির বিশেষ ভঙ্গির অঙ্গন্যাস: 'এই উত্তর তার, রোমনির কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জন করে ফিরল, কোন কান দিয়ে ঢুকলে খুব ভাল হবে এই ভেবে সে একবার অন্যটি উঁচু করলে, ...' (ঐ, পৃ-৩০)। তুড়সীর সারি দেয়া পাঁজরে হাসি খেলা করে (ঐ, পৃ-৩৬)। হাঁসের পিঠে পা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে তুড়সী, যেন এ ভাবেই নিজের করা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে (ঐ, পৃ-৪৫)। শবরীর খোঁপায় বাঁ দিকে টানুনী, কারণ তীর ছোঁড়ায় অভ্যস্ত সে (ঐ, পৃ-৪৯)। থামের গায়ে খোদাই করা লতা-পাতার ছায়া আর সেখানে 'পাখীর আহ্লাদ ছিল' (ঐ, পৃ-৫০)। বৃদ্ধের মুখে আলোর সূক্ষ্ম প্রক্ষেপ: 'বুড়োর মুখে আদ্ধেক ভাগে আলো, আধা কালো-চোখে ওঝার মত চাহনী, এখানে খানিক কম আলো হল' (ঐ, পৃ-৫১)।

বেশির ভাগ আলোচক কমলকুমারকে আদ্যোপান্ত পাঠ না করেই তাঁকে লোকাতীত সফিস্টিকেটেড ডান্ডি লেখকের তকমা মেরে ফাইলবন্দী করে রাখেন। যেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যোজনা দূরে তাঁর কেতাবী জগৎ। অথচ তাঁর টেক্সট বলে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। মানুষের দেহমনের প্রতিটি সংস্থানকোষ ও স্পন্দনের আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের স্তরে উঠে গেছে তাঁর দৃষ্টি। 'শবরীমঙ্গলে'র মত প্রাথমিক উপন্যাসেও এ রকম উদাহরণ ভূরি ভূরি। আদিবাসী এলাকায় পাল্‌কীবেহারারা শ্রেণীগত দিক দিয়ে ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর পর্যায়ে পড়ে। ভারী সোয়ারীঅলা পাল্‌কীর বাঁক বয়ে বয়ে তাদের কাঁধে কড়া পড়ে যায়, এটা একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও পরিচিত ব্যাপার। কিন্তু ভারগ্রস্ত পদক্ষেপের তালে তালে ধুঁকে ধুঁকে শ্বাস টানতে টানতে এই শ্রমজীবী মানুষগুলোর পলকা পাঁজরগুহায় তথা হৃদযন্ত্রের গলিঘুঁজিতে যে অমানবিক ক্ষয়কাজটি চলে, তার কম্পন একমাত্র কমলকুমারের কলমের সূক্ষ্ম র‍্যাডারেই ধরা পড়া সম্ভব: 'পাঁজড়ায় কারো কারো যেন নিষ্ঠুরতার চিহ্ন, হাজার বছরের সৌখিন নিঃশ্বাস যেন বা এই সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত উঠে উঠে যায়' (ঐ, পৃ-৫৬)। সুকুমার রায় নিছক রসবৃদ্ধির খেলাচ্ছলে আকাশের গায়ে 'টক টক গন্ধে'র স্বাদ পান। আর কমলকুমার বাস্তবেই প্রাকৃত এক বৃদ্ধার গায়ে বাসি বাসনের 'টক গন্ধ' পান, 'বেঁচে থাক' স্বস্তিবাচন শুনে সে গন্ধ উড়েও যায় আবার (ঐ, পৃ-৬০)। মাধালি বসে চুটা টানে, সেও একটা লোকজ সংস্কৃতির নিযাসিপ্রায়: 'মাধালি সেটা গাঁজার কল্কের মত ধরে অসম্ভব তারসপ্তকে ঘাই মারা টান দিয়ে, ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল—এবং অন্ধকারে অথবা আকাশে মিশে গেল' (ঐ, পৃ-৭৩)। যাত্রার মেলায় গিয়ে আদিবাসী মেয়েরা পৌষের শীতে রাতভর নেচেগেয়ে হাঁড়িয়া টেনে শেষে 'সজাগঘুম' ঘুমোয়। এই চিত্রটি অবিস্মরণীয় তুলিতে রেখাবন্দী করেছেন কমলকুমার: 'যাদের গোছ ভাল, তাদের বাড়ীর মেয়েরা গাছতলায় হেলান দিয়ে কি ঘুমায়, হাতের বুড়ো আঙুলে হার তুলে, দুই কানের দুই পাশ ধরে—কি ঘুম, কি ঘুম, মাদল বাজে ঘুম ভাঙে না চুলে টান পড়ে কিন্তু হাত ছাড়ে না। 'আমি যদি ঘুমাই তেমন সজাগভাবেই ঘুমাবো' (ঐ, পৃ-৮০)। বিবেকেরুহর্ষির মাধালির দ্বিধাগ্রস্ত পথ চলার বিবরণ: 'পাহাড়ী রাস্তায় নেমেও ছিল কিন্তু কি জানি কি ভেবে ডান পা দিয়ে বাঁ পাকে লাথি মেরেছে—এবং অন্য পথ ধরেছে' (ঐ, পৃ-৯৮)। উপস্থিত রক্ত দেখতে পেলে পূর্বের রক্তাক্ত ঘটনার স্মৃতি মনে পড়বে, সেই আশায় পরাণ তার নিজের রক্তাক্ত (ঘোড়া) দাঁতের হাত দেয় (ঐ, পৃ-১১৫)।

উপন্যাসের রক্তমাংসের জায়গাটি সাধারণত এর চরিত্র-সংলাপ। বিচিত্র মুহূর্তে পাত্রপাত্রীর মুখে উচ্চারিত আবেগ উত্তাপে জীবন্ত সব বাক্য, কখনো বা অর্ধোচ্চারিত বাক্যাংশ, ধ্বনো, মুদ্রাদোষ, আপাত অর্থহীন অব্যয়, এমন কি অস্ফুট ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জ; — এ সব থেকে সুনির্বাচিত অংশের কখনো হুবহু কথনো শিল্পময় অনুবাদ—এতেই একজন জীবনশিল্পী কথা সাহিত্যিকের সিদ্ধি। কমলকুমার এ বিদ্যায় প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও প্রাথমিক রচনা, তবু 'শবরীমঙ্গলে'র পাতার পর পাতা সংলাপের এই যাদুকরী প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ। ঝুমুরওয়ালীর ঘরে উঠেছে মাধালি। সেখানে ডুগিতবলা মদের বোতল ইত্যাদি ফূর্তির চালচিত্র দেখে খ্রীষ্টান ধর্মদীক্ষিত পিউরিট্যান মন তার সখেদে বলে উঠতে চায়, 'আমি এখানে বসে ছিঃ!' কিন্তু এই 'লাচনী' রোমনির বাড়িতে সে তো নিষিদ্ধ এবং অবচেতন ভালবাসার টানে স্বেচ্ছায় এসেছে। তাই আত্মসমালোচনামূলক 'ছিঃ' পর্যন্ত পুরো সংলাপটা আর বেরিয়ে আসতে পারে না কণ্ঠনালী দিয়ে। 'আমি ইস' (ঐ, পৃ-১১), এই টুকু প্রাথমিক ধিক্কারোচ্চারণেই গলা আটকে যায়। বোন লুহানীর সঙ্গে বসে সুখাদ্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাধালি এমনই কথা ঢঙে অদ্ভুত অব্যয়ধ্বনি শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে, তাতেই পুরো সংলাপটি জীবন্ত হয়ে ওঠে, 'দুঃশালা সরষে চমকান ছড়ান ভাত, আর ভুট্টার খৈ-এর স্যাকা বড়া — দুং —' (ঐ, পৃ-৭৬)। অদ্বৈত মিশ্রকে তিরস্কার করার সময় রোমনির মুখ থেকে কত অবলীলায় লাগসই প্রাকৃত ম্লাং ঠিকরে বেরোয়: 'লজ্জা করে না বামুনগিরি ফলাতে, ম্যাগ কত!' (ঐ, পৃ-১২)। মাধালি তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলে ল্যাংড়া সুবাই অর্থহীন অব্যয়ে পাল্টা শিষ্টতা প্রকাশ করতে থাকে, 'রে রে দু দুঃ ক্ষেপা হইছ!' (ঐ, পৃ-১০৯)। রোমনির প্রকাশ্য উপেক্ষায় অপমানাহত অদ্বৈত ঠাকুর ভিতরে ভিতরে আধাকাব্যিক আধাপ্রাকৃতের মেশাল দেয়া অদ্ভুত এক স্বগতোক্তির বুদ্বুদে গজরাতে থাকে। এ সংলাপের মূল ভাব তার অক্ষম পৌরুষের আস্ফালন: 'শালা আমার সঙ্গে ঘুৎসুড়ি ছক্কাপাঞ্জা! যে-আমি অন্ধকার খাই, যে-আমি ঢাল দেখিয়ে নদী পার হই, যে-আমি ফরাস কুঁকড়ুদি হাটের ভীড় কাছে আনি, আমার গা বেয়ে গাছলতা উঠবার চাপ দেয়—শালা—একদেহের হিমে লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় আগত হাঁসের ডানা খুলে যায়—বন্ধ হয়' (ঐ, পৃ-২৬)। বিয়ের জন্যে রোমনির চাপা আকুলতাকে তুড়সী 'হেদাইছে' শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করে। ঢেঁকীতে পাড় দিতে দিতে তুড়সীর কাছে রোমনি প্রথম মাধালিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আবেশঘন মায়াবী ভাষায়, 'যে রাতে পহেরা দেখা হয় তখন আমার এক কথা মনে হল, এখন সে কথা বেজার—এখন আর এক কথা মনে আসে—তবে বটে আমার মন উঃ উঃ করে—এখন ভারি অ্যালিঢ্যালি করে—এখন মনে লয় গতর আমার ভারী—মনে লেয় যেন দশ মাসের গতর' (ঐ, পৃ-১৭)। মাধালিকে পাদরী ফ্রান্সিস চার্চের ভিতরে প্রবেশ করতে আহ্বান করেন। ডরপ্রুক মাধালি চোরা আহ্লাদে তার বেপথু মনোদশা জানাতে গিয়ে বলে, 'আমি উয়ার মধ্যে গেলে কি আর খেতে লিতে পারবো?' (ঐ, পৃ-৫৭)। নিতউপোসী মাধালির মনে রোমনির প্রতি নিষিদ্ধ আকর্ষণ, 'এ যেন গরীবের ঘোড়ারোগ'। কিন্তু মাধালির নিজের জবানীতে তার এমন দ্বন্দ্বদীর্ণ দুদর্শার কী জীবন্ত বর্ণনা, 'আমাদের খাবার নাই কিছু নাই—আবার এই দুই কেনে—আমার ভিতরে কুকুর সেন্দাইছে—কার্তিকের মত—' (ঐ, পৃ-৫৩)। পাদরী ফ্রান্সিসের কাছে ঘুনরী তার পূর্বজন্মের স্মৃতিকথা বলে, 'বাবা গো জানিস

আমার মনে লেয়, আমি বহু পূর্বে সেই লৈকাকাঠ ছিলাম, যেখানে প্রভু ঘুমাইছিল, অলায় বল্লাম হে ... ...' (ঐ, পৃ-৫৬)। এই অনুর্বর পাথুরে দেশে বৃষ্টি হতে চায় না। এবং অনাবৃষ্টির সমূহ কারণ যে বামুনের অজন্মা, জটার তাতে কোন সন্দেহ নেই। রোমনিকে তাই সে বলে, 'তা— লা। পাক ছাটিটি বামুন না জন্মালে এ মারাট্টা দেশে' বৃষ্টি হবে কি করে গো—খালি পাহাড় আর শাল পিয়াশাল—খাড়ি জমি দেখা গা গঙ্গাড়ী দেশ—মা গঙ্গা নিজেই পৈতে—কত বামুন কত কোম্পানী হে—কি বল' (ঐ, পৃ-২৭)। জটা সুযোগ পেলেই তার জড় বুদ্ধির রসায়নে সাধামত দার্শনিক কথা বলার চেষ্টা করে। যেমন, 'ত মিছাই বলব না গো, অধর্ম বলবো না সামনে বামুন আছে' (ঐ, পৃ-৩৩)। এ রকম লোকায়ত দার্শনিক উক্তি এই সব অশিক্ষিত আদিবাসীর মুখে হরহামেশা উচ্চারিত হয়। অনাবৃষ্টির কারণে ধান আক্রা, তখন হাতআঁজলায় ধান বিকোবে। এই ভাবটাকে মাধালি নিজের মত রূপক ভাষায় প্রকাশ করে, 'লাজের জায়গা ছোট বলি কাপড় অল্প হয়—তাই জুটে না' (ঐ, পৃ-৭৪)। মাধালির কাছে রোমনির আত্মপরিচয়ের ভাষাটি এরকম: 'আমি লাচনী কি ঢেমনী... ...' (ঐ, পৃ-১৭)। নিখোঁজ মাধালি সম্পর্কে তার পড়শীদের উক্তি, 'মানুষটা পাই পইসা হইল গো' (ঐ, পৃ-৮৬)। ভাই মাধালির খোঁজে লুহানী অরণ্যে-কান্তারে উন্মাদিনী হয়ে ঘুঁড়ে ফেরে। তার সেই আকুল অন্বেষণের কাহিনী নিজস্ব অদ্ভুত রূপকের ভাষায় মাধালি বর্ণনা করে শোনায়, 'পাখি ছ্যাঁ-লওয়া বাজের পিছু যেতে লারে তবু ছায়া যে ঠাঁই পড়ে সেই ঠেন সেই ঠেন ধায়—' (ঐ, পৃ-১১২)। বাচ্চাকে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে যাওয়া বাজপাখির দ্রুত অপসৃয়মান ছায়াকে ধাওয়া করা মা-মুরগীর এই চিত্রকল্পের সঙ্গে একজন নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরার এ রকম মোক্ষম তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। এ ধরনের আরো একটি দ্বিতীয়রহিত উৎপ্রেক্ষার নিদর্শন ১৩০ পৃষ্ঠায় মেলে। সেখানে লতাপাতাকে মুরগী ঠাউরে কামমত্ত 'ছোড়া-মোরগের আঁড়তাড়ায়' ঠোঁট ঠোকরানোর কথা বলা হয়েছে, যেন সে মুরগীর ঘাড়েই ঠোঁট বসিয়েছে। আসলে কমলকুমারের উদ্ভাবন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির, যদিও এ বইয়ে আদিবাসীদের মুখ দিয়েই তা ব্যক্ত হয়েছে। মাধালিকে লুহানী বলে, 'পাখীরা মাই দেয় না বলে কি আর মা লয় গো ... ...' (ঐ, পৃ-১২৫)। পরাণ যখন মাধালিকে বনে বনে ঢোঁড়া বাদ দিয়ে ঘরে বসে ভগবানকে ডাকতে বলে, মাধালি তখন এক আশ্চর্য উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দেয়, প্রত্যেক জিনিসের জন্যে তার একটা নিজস্ব ঠাঁই দরকার, অজায়গায় অবস্থানে তাকে মেলে না। সে বলে, 'আয় যদি বাড়িতে বসে হইত, তাহলে সেয়া মাঠে কেনে দেখা দিবে, চালাতে চালাতে চিতি সাপ উঠে, আকাশে চিতি সাপ নাই' (ঐ, পৃ-১১৭)। কমলকুমারের কলমে আদিবাসীদের ভাষায় ঐ উপন্যাসে মদ হয় 'ক্রেস্তান' (ঐ, পৃ-৩৯); শরীর 'লায়েক নাই' (ঐ, পৃ-১৩); ছোট শিশুকে বলা হয় 'কচিপোনা' (ঐ, পৃ-৬২); ভগবান 'মদের চাট' (ঐ, পৃ-৩৯) এবং খুব বেহালাত অবস্থায় শরীরকে মনে হয় 'কামিজ'।

উপন্যাসের মূল কাহিনী দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র জটের উপর ভিত্তি করে। একদিকে আরোপিত খ্রীষ্টীয় মরালিটি ও পিউরিট্যান এথিক্সের এমবার্গো বা বিধিনিষেধের আত্মগুঁড়ণ, অন্যদিকে মানবিক হৃদয়ধর্মের সরল অথচ দুর্মর প্ররোচনা। একদিকে অভ্রভেদী চার্চের চূড়া, অন্যদিকে ঝুমুরওয়ালী রংগিলী কন্যা রোমনি। একদিকে পুঁথিগত শুচিচেতনা, অন্যদিকে

স্বতোৎসারিত প্রণয়প্রস্রবণ। এই দুই বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির টানাপোড়েনে, অপরাধবোধ তথা পাপচেতনা ও প্রেমোন্মাদনার যুগপৎ আক্রমণে আদিবাসী যুবক বেচারী মাধালি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সেই জখম আত্মারই অনবদ্য শিল্পরূপায়ন 'শবরীমঙ্গল'।

তবে উপসংহারে এসে কমলকুমার তাঁর নিজেকে শুধু নয়, মানববর্ষমাত্রকেও স্থিতিয়ে দিয়েছেন। রোমনির আকর্ষণ থেকে বাঁচার জন্যে মাধালি ঘর ছেড়ে জঙ্গলে-চার্চে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। দুঃসহ আত্মনিগ্রহের কাছে প্রত্যাবর্তন মাধালির। এটাই উপন্যাসের শেষ সংবাদ। কে বলে কমলকুমার মজুমদার প্রতিক্রিয়াশীল তথা মানুষ থেকে দূরে?

'শবরীমঙ্গলে' কিংবা তারও আগে 'লাল জুতো' গল্পে (১৯৩৮) বাংলা উপন্যাসে নব্য আধুনিকতার যে আশ্চর্য সম্ভাবনা সূচিত হতে যাচ্ছিল, 'অন্তর্জলী যাত্রা'তে যা সবে মাত্র শিখর স্পর্শ করে, অচিরেই তার অকালমৃত্যু ঘটে। স্বখাত সলিলে স্বেচ্ছানিমজ্জন ঘটে এই দূরাকাঙ্ক্ষী নিরীক্ষার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মহাট্র্যাজেডি এটাই। এবং কমলকুমার সেই ট্র্যাজেডির অপমৃত দৈত্যশিশু (নাকি বালকবীর?)। নিয়তি কেন বাধ্যতে!

[লেখাটি ঢাকার 'শিক্ষাবার্তা' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত ও পুনঃপ্রকাশিত।
লেখক : ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদালয়।] স.অ.

জাতের নামে বজ্জাতি সব

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় পর্ব)

রামমোহনই এই যুগের প্রথম ভারতীয় যিনি স্বীকার করেছিলেন, যে জাতিবিচার বা বৈষম্য একেবারেই অর্থহীন, ভেদবুদ্ধি অবান্তরও। তিনি বুঝেছিলেন, হাঁড়ির তলায় আঁচ না দিলে তো আর রান্না হয় না। অতএব যারা নিম্ন অধিকারী, যারা শাসিত, সমাজে অচ্ছুৎ, অবহেলিত, ভয়ার্ত, দীন ও পীড়িত' তাদের মুক্তির জন্যে কাজ করে যেতে হবে।

গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাস প্রশ্রয়পুষ্ট প্রথাগুলি ক্রমে কুসংস্কারে পরিণত হয়। সেই ভ্রমই একসময় হয়ে পড়ে নিয়ম। আমাদের দেশে সেসময় এমন সব লোকজন ছিলেন যাঁরা সতাই বিশ্বাস করতেন জাতিভেদ প্রথা 'ভাঙার ফলেই দেশে মহামারি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি এসব হতে পারে। শাস্ত্রের অনুশাসনেইতো আমরা আধমরা হয়ে পড়ি! আবহমানকাল ধরে নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের এভাবেই আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে।

সাহিত্য ও সমাজে রূপান্তরের দায় একসময় গ্রহণ করলেন রামমোহন। মধ্যযুগীয় জীর্ণ বাসা ভেঙে তিনি আমাদের দাঁড় করাতে চাইলেন বুদ্ধি বিচারের মুক্তক্ষেত্রে। ধর্মের নাম করে সেসময় বিধবাদের অকারণে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হতো। এও এক জাতিভেদ বৈ কি! 'ছোট জাত' বলে মৃতদেহ সৎকার করার লোক পাওয়া যায় না। মুন্সী প্রেমচন্দের 'সদগতি' গল্পের এটাই তো বিষয়। পরে সত্যজিৎ রায় তাকে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন।

এই জাতিভেদের নাম করেই হৃদয়হীন মানুষ অজ্ঞাতকুলশীল মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিয়েছে। পাছে ছুঁলে জাত যায়। ছায়া অব্দি মাড়ায় নি। মানুষের হার্দিক স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়েও বেশি ঘৃণা করেছে। প্রথার দৌরাত্ম্যে তার মানববোধ তখন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর এই সমাজকেই কলুষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অনেকেই সেদিন ধুয়ো তুলেছিল 'জাতের নিকেষ রামমোহন'। তাঁকে ম্লেচ্ছ, বিধর্মী বলে আখ্যা দেওয়া হল।

তা সত্ত্বেও প্রবল ব্যক্তিত্ব, পরিচালন ক্ষমতা ও যথার্থ নিষ্ঠা নিয়ে জাতপাতের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

জাতিভেদ ভারতের রাজনৈতিক দুর্দশার অন্যতম কারণ। সেজন্য তা দূর করতে হবে। একথা রামমোহনই প্রথম বললেন। স্বাধীনতা লাভের পর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইনও বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই, আইনের মাধ্যমে মনের সংস্কার দূর করা সম্ভব কি? এ সমস্যার গুরুত্ব না বুঝলে বাইরে থেকে তাকে মার খেতেই হবে।

একটি ঘটনার দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। ১৯৮১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'স্টেটসম্যান'-এর প্রথম পাতায় মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার দুবদা গ্রামে হরিজন নিগ্রহের একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল। এই সংবাদের ভিত্তিতে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ তারিখে সমিতি ঐ গ্রামে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠায়। এই পর্যবেক্ষক দলে ছিলেন সমিতির সম্পাদক সুনীল পান, সুব্রত পান্ডা ও কুমার ভট্টাচার্য। এঁরা দুর্গত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের কিছু বক্তব্য টেপ

রেকর্ড করে আনেন।

এছাড়াও এঁরা সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এঁদের তদন্তের ফলে জানা যায় যে অজিত পাত্র নামক জনৈক নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত ব্যক্তি মাহিষ্য কন্যা শঙ্করীকে বিয়ে করার ফলেই গোলমালের সৃষ্টি। শতাধিক গ্রামবাসী পাত্র পরিবারটির বাড়ি আক্রমণ করে। অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ চালায়। অজিত পাত্রের বৃদ্ধ পিতার ওপর দৈহিক অত্যাচার করে।

'ত্যাগ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৮৯২ সালে। সেখানেও একইরকম সামাজিক সমস্যার ছবি মেলে। এই গল্পের নায়িকা কুসুম বালবিধবা, কায়স্থ কন্যা। তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে অভিজাত সমাজপতি ব্রাহ্মণ হরিহর মুখার্জির পুত্র হেমন্ত মুখার্জি। এই বিয়ের অপরাধে (?) পিতা হেমন্তকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ 'বৌকে এখনি বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দাও।' এই নির্দেশ কুসুমের কানেও গিয়েছিল। কেঁপে ওঠে তার মন। সে ভীরু কপোতীর মতো হেমন্তের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। হরিহর পুত্রের উদ্দেশ্যে গর্জন করে বলে উঠলেনঃ 'জাত খোয়াইবি?' হেমন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে উত্তর দিয়েছেঃ 'জাত আমি মানি না।' পিতা হরিহরের শেষ কথা ছিল, 'তবে তুই শুদ্ধ দূর হইয়া যা।'

তবু সময়টা খুব বদলেছে কি? একশো বছর পরেও? নএঃর্থক দৃষ্টান্তটি আগেই বলা হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের এই উপস্থাপনা বাস্তবেই অভিনব। কেই বা সবর্ণ-অসবর্ণের নিরিখটা ঠিক করে দিতে পারে? বিশেষ করে মিশ্র সংস্কৃতির এই আমাদের দেশে। ইতিহাস বা বিজ্ঞান তো এই বর্ণবিভাগ বা জাতবিচারকে স্বীকার করে নি। কিন্তু পরিবর্তন কোথায়? রবীন্দ্রনাথের গল্পে কিন্তু হৃদয়ধর্ম সামাজিক সংস্কারের উপরে জয়ী হয়েছে। হেমন্ত জাত বাঁচিয়ে প্রেম করতে চায় নি। জাতপাত ভেঙে সবার উপরে রেখেছে তার ভালোবাসাকে। এটা রবীন্দ্রনাথের সচেতন জীবনবোধের ফলশ্রুতি। হেমন্তের সৎসাহসকে সমর্থন করেছেন তিনি।

ধর্মতন্ত্র ও মানব সত্যের সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ মানবসত্যকেই গ্রহণ করেছেন বারম্বার। কুসুমের হৃদয়ার্তি এবং হেমন্তর সংগ্রামমুখী চেতনা জাতপাতের অন্ধ আবর্ত অতিক্রম করতে চেয়েছে। লেখক তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। জাত মেরে দেবার গভীর ব্যক্তিস্বার্থও সক্রিয় থাকতো কখনো বা। তাকেও তিনি দেখিয়েছেন। পল্লীসমাজের দলাদলির ইঙ্গিতও আছে। 'ত্যাগ' গল্পে হরিহর এক ব্রাহ্মণের জাত মেরেছিলেন সমাজ শিরোমণিরূপে। প্যারিশংকর তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

হেমন্ত-কুসুমের মিলন ঘটানোর হোতা সেই প্যারিশংকরের জামাই বিলাত গিয়েছিল ব্যারিস্টার হবার জন্য। হরিহর মুখার্জির মতে, সমুদ্র যাত্রা করে সে জাত খুইয়েছিল। প্যারিশংকর হরিহর হাতে পায়ে পড়ে বলেছিলেন 'আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া জাতে তুলিব।' কিন্তু সমাজপতি হরিহর তাকে ক্ষমা করেননি। তাকে সমাজচ্যুত করেছেন। সেকালে সমুদ্রযাত্রা করলেও জাত যেতো। শাস্ত্রমতে তা নাকি নিষিদ্ধ ছিল। বাঁচা গেল, তাহলে স্বামীজী থেকে নেতাজী জাত সকলেরই গিয়েছে।

'A century of Social Reform' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'Until the begining of this century Hindus were forbidden by caste rules from going a sea-

voyage'. ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পরিবারকে সমাজে নিগ্রহের শিকার হতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'একঘরে' হয়েছিলেন।

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ পীড়িত এই দেশে ১৮৯১ সালে 'দালিয়া', সর্বমানবিক চেতনারই পরম অভিজ্ঞান। সংকীর্ণতার অচলায়তন ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গল্পে মোগল রাজকুমারী তিনি ভালোবেসেছে মগ রাজকুমার দালিয়াকে। উভয়ের মধ্যে ধর্ম, আভিজাত্যে, সামাজিক মর্যাদায় অনেক ফারাক। কিন্তু মানবহৃদয়ের ঔদার্যের কাছে তা দূর হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এইসব ব্যতিক্রমী গল্পগুলির পশ্চাৎপটে বাস্তব জীবনের সাক্ষ্যও আছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে মহাকাত্যায়নের মতো পারদর্শী ব্রাহ্মণও জাতিবিচার মানতেন না। জাতিভেদপ্রথার পাশাপাশি এই ধারাটিও কিন্তু বহমান ছিল। কোসাম্বীর 'ভগবান বুদ্ধ' বইটিতে এই মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম দেখালেন 'আর্য' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যাযাবর', আর 'দাস' ও 'দাশ' শব্দের অর্থ 'দাতা'। মহাভারতের যুগে বিদুর ছিলেন অব্রাহ্মণ, অথচ পরম জ্ঞানী।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল এহেন জাতপাতের দ্বন্দ্বেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শুধু ডোমজাতের কবি বলেই গাঁয়ের মেলার আসরে, ঝুমুর দলের গানের সময় তাকে ইতর বিদ্রূপ আর রসিকতা সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেব কবিয়ালের 'চাপান' ছিলো এইরকম —

'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা-স্বগ্‌গে যাবার আশা গো
গরুড় হবেন মশা গো-স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।'

তবু তা ছিলো সাজানো লড়াই। কিন্তু জড়দণ্ডার ব্রাহ্মণ বিপ্রপদ যখন ছদ্ম শুভেচ্ছায় ঘুঁটের মেডেল দিতে চায়, বারবার ইচ্ছাকৃতভাবেই নিতাইকে 'মহাকপি' বলে সম্বোধন করে, তখন মানবতার অপমানে আমরা ব্যথিত হই। পাঁকে জন্মেও জীবনে যে পদ্ম হয়ে ফোটা যায়, সেটা এরা বোঝে না। ধোপদুরস্ত চাকরিজীবী এই ফুলবাবু বিষঢালা বিস্ময়ে তাই বলে, 'Yes, নিতাই? সে রীতিমতো একটা বিস্ময়। Son of a Dom আঁ! He is a poet?' তারপর অনাবশ্যকভাবেই জ্ঞান দেয় 'কিন্তু খবরদার, আপন জ্ঞাতি-গুষ্টির মতো চুরি ডাকাতি করবি না, তাই বেটা কবি a poet.' আসলে জ্ঞান দিতে তো আর পয়সা লাগে না। এইসব উঁচু জাতের 'প্রভু'রা কি করে অনুমান করবে, নিতাই-এর আত্মনির্মাণ, তার 'হয়ে ওঠা'-র নিভৃত সংগ্রামের কথা। হাততালি আর উপদেশ দিয়েই তাদের কর্তব্য ফুরিয়ে যায়।

ভালো আর মন্দ, সুরুচি আর কুরুচি জাত তো আসলে এই দুইরকম। কথায় বলে, 'জন্ম হোক যথাতথা/কর্ম হোক ভালো'। নিতাই-এর ক্রাইসিসই যেন মহাভারতের কর্ণের মতো 'সূত্রপুত্র' বলে অস্ত্রবিদ্যায় পরীক্ষা দেবার সুযোগও সে পায় নি। আজো কেন জাতপাতের ধ্বজা তুলে একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত করা হবে? এ প্রশ্ন হাজারো বার আমাদের মনে জাগে।

নিজের সমাজে 'কবি'র নিতাই কবিয়াল তো এক আহাম্মক আউটসাইডার। সে তো হঠাৎ কবি হয় নি। তার আবাল্য প্রস্তুতি ছিলো এই জন্যে। অনেকেরই সেটা চোখে পড়ে নি। নিতাই নৈশবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে ভালোবেসে মুখস্থ করেছে।

শেষ পর্যন্ত ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয় উঠে যাওয়ায় তার লেখাপড়ায় অনিচ্ছুক ছেদ নেমে এসেছে। কিন্তু সে তো পূর্ণচ্ছেদ নয়। ইতিমধ্যেই সে তার বীরবংশী সতীর্থ সহোদর-স্বজাতির থেকে ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়েছিলে। মনে পড়বে, 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম-ও বলেছিল একদিনঃ 'সকল জাত ছাড়া আরও দুটো জাত সংসারে আছে-শিক্ষিত আর অশিক্ষিত'। (পৃ-১২১) এ মন্তব্যে জাতপাতের অর্থহীনতা পরিষ্কার।

আন্তনিও গ্রামশি-র ভাষা অনুসরণ করে কেউ যদি নিতাইচরণকে বলেন 'সাবলটার্ন কবি'। তাতে একটা ছবি ফুটে উঠলেও সবটা বলা হয় না কিন্তু। সত্যি বলতে কি, মোটামুটি সজ্জন হওয়াটাই যে বংশে ঘোর বেনিয়ম-সেখানে কোথায় থাকে জাতপাত? 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র' নিতাইচরণের পক্ষে কবি হওয়াটা নেহাত সহজ কাজ ছিলো না।

আসলে জাতপাতের উর্ধে নিতাইয়ের ছিল এক উত্তরণের ইতিহাস। রাঢ় বাঙলার এই নিম্নতম বর্গের কবিয়ালটি যেন অভিশপ্ত সিসিফাসেরই সন্তান—রক্তাক্ত ওঠাপড়ার, অনিকেত জীবনযাপনের, অবিরাম পীড়নের। জাতের জন্যেই কতো অপমান তাকে সইতে হয়েছে। তারাশঙ্করের 'কবি' এখানেই জাতপাতবিরোধী মানবতাবাদের দলিল হয়ে ওঠে। এ হলো নিতাইয়ের স্মৃতিপথের পাঁচালি তার ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণের কথা। আসলে অন্ধকারে বদ্ধমূল এক মানুষেরই ইতিকথা-আলোকস্পর্শই যার লক্ষ ও অঙ্গীকার।

'সন্দীপন পাঠশালা'য় তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন তথাকথিত নিচু জাতে জন্মগ্রহণ করেও নায়ক সীতারাম 'অতি বাস্তব মাটির পৃথিবীর বুকের বাধা-বিঘ্ন' (তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, পৃ-৩) কাটি য়ে 'আকাশের দিকে মুখ তুলে পথ' চলে। উচ্চবর্ণের প্রতি সীতারামের ভয়ের সঙ্গে ঘৃণাও আছেঃ 'এখানে মদ প্রায় সকলেই খায়, প্রবীণেরা তন্ত্রমতে 'কারণ' করেন, নতুনেরা নিজেদের আড্ডায় ইজ্জত রেখে খান। জন কয়েক কিন্তু নিয়মিত মাতাল আছে, যারা দোকানের মদ খেয়ে রাস্তায় হল্লা করে, আস্তিন গুটিয়ে গুন্ডামিও করে, কিন্তু ছুরি-ছোরা চালাতে সাহস করে না, তবে নিরীহ কাউকে পেলে দু-চারটে কিল-চড়-ঘুষি চালিয়ে দেয় অমিত বিক্রমে।' (পৃ-১৯) আর, সেটা 'ভদ্রলোকের গ্রাম, ব্রাহ্মণের ছেলে,' কিন্তু তারা লেখাপড়া শেখে না।

তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, উচ্চবর্ণের এই লোকগুলির তুলনায় কৈবর্ত সীতারাম আদর্শ মানুষ। লেখাপড়া শিখে সমাজের নিম্নস্তরের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কাজে অগ্রণী। উচ্চবর্ণের কিছু লোক দুস্তর বাধা সৃষ্টির চক্রান্ত চালায়। তবু অদম্য উৎসাহে সীতারাম তার ব্রতে অটল।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম কোতলঘোষায় এক কায়স্থ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে জাতপাতের প্রশ্নে আপত্তি ওঠে। বিদ্যালয় পরিদর্শক রজনীবাবু ঐ কায়স্থ পণ্ডিতকে বললেন-'এসব কথা বললেন কেন আপনি? তারা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ।' পণ্ডিতটি তখন হাত জোড় করে বললে-আজ্ঞে বাবু, কায়স্থ হলেও তো আমি মানুষ, সহ্যের তো একটা সীমা আছে। ছেলেটা একেবারে ষণ্ড হয়ে উঠেছে! ..... সেদিন একজনের কান কামড়ে রক্তারক্তি ব্যাপার। কানে ধরলাম তো মহিষের মত রক্তচক্ষু করে বললে—খবরদার, কায়েত হয়ে কানে হাত দেবে না তুমি। আমার গুরুর কান, মন্তর হয়েছে আমার। রজনীবাবু চটে উঠলেন—কঞ্চি দিয়ে বেশ ঘা কতক দেন নি কেন?

পণ্ডিত বললে-তা হলে কোন দিন আমার মাথা ফেটে যাবে হুজুর। ব্রাহ্মণ নই, নিরীহ শিক্ষক-সে যে গো বধ হবে বাবু।' (পৃ-৭৭) এখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের জাতপাত বিভেদের গোপন কথাটি ধরা পড়েছে। মান, অপমান, পুরস্কার-তিরস্কার-সবই জাতপাতের ভিত্তিতে স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু আসল কথা তো শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মানুষের আর্থিক স্থানাঙ্কবিন্দু। এই কাহিনীতে দেখি, অবসরপ্রাপ্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিক্ষক তার জাতের লোকেদের কাছে না গিয়ে কৈবর্ত শিক্ষক সীতারামের কাছে হাজির হয় ঃ

'দুপুর হয়েছে, বিশ্রাম চাই, ক্ষিদে তেষ্টাও পেয়েছে। তা একবার ভাবলাম, যাই বাবুদের ঠাকুরবাড়ি। কিন্তু ইচ্ছা হল না। তোমার কথাই মনে হল। শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। বাবু ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখিরি-ব্রাহ্মণ তো এক নয়। মনে হল, পাঠশালার পণ্ডিতস্য পাঠশালার পণ্ডিতং গতি।' (পৃ-১৩৪)

'সন্দীপন পাঠশালা'র আসল কথা জাতপাতের চেয়ে বড়ো রুটি-রুজির লড়াই। জাতভেদে নয়, শ্রেণী অবস্থানের ভিত্তিতেই শোষক আর শোষিতের পার্থক্য। এই সমাজ কাঠামোর সীতারাম এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঠিক 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের ক্রাইসিস তার। একজন সংগীত, অন্যজন জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চায় কুলকর্মের সীমা ডিঙিয়ে যেতে চায়। আর একটি শ্রেণী বিভেদ ছিইয়ে রেখে চায় তাদের উপর শোষণ চালাতে।

একই কাজে নিযুক্ত লোকেদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কের কথা এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। সীতারাম মনে করতো যে বা যা অধম, সে বা তা-ই অচল। জীবনের অভিজ্ঞতায় তার মত বদলেছে। সে বলেছেঃ

'দেখুন না আমাদের দিকে তাকিয়ে, অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, তাই অচল হয়েই রইলাম সংসারে। শিবকিঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখুন অধম কুলে অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মায় নাই বলেই অচল হয়েও উত্তম বলে চলে যাচ্ছে। এখন সে মনে মনে স্বীকার করলে, যে চলে না সেই অচল, যে চলে সেই অধম। জয়ধর চলেছে ছুটেছে। সেই সচল।' (পৃ-১৫৪)

উপন্যাসের একেবারে শেষে অন্ধ নায়ক নিচুজাতির সীতারামের এই উপলব্ধিতে জাতপাত ভেদাভেদের অস্তিত্ব আর নেই। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঘটনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার ব্যাপার প্রসারে অনেক সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে উঁচুনিচু ভেদ মুছে গেছে। নিচুজাতির হয়েও উচুঁজাতির সম্মান পেতে আর কোনো বাধা নেই। উচুঁজাতির জমিদারবাড়ির ধীরানন্দ 'দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে' (পৃ-১৫৮) সীতারামকে প্রণাম করে।

তবু তারাশঙ্কর কি মুক্ত হতে পেরেছিলেন মধ্যযুগীয় বদ্ধমূল সংস্কার থেকে? জাতিপ্রথার ঘেরাটোপ থেকে? সর্বাংশে? বোধহয় নয় সবটুকু। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো তাঁর মনেও। রক্ষণশীলতার ক্রাইসিসও ছিল প্রচুর। অথচ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মাঝখানে তো কোনও মধ্যপন্থা থাকতে পারে না। অগ্রগতির দিশারী হবার পথে সেই দ্বিধা, সীমাবদ্ধতা নিয়েও সিদ্ধির আকুল আর্তির কথাই বলবো পরের পর্বে। এবার এইটুকুই থাক।

(ক্রমশ)

দায়বদ্ধতার দায় - অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে

আয়েশা খাতুন

"মনরে কৃষি কাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা"
—রামপ্রসাদ

অন্ধকার ঘর . না ঘর বলা যায় না, হলঘর। নাটক হয়, থিয়েটার হয়, আমরা অনেক দর্শক বসে আছি, ড্রপসিন ধীরে ধীরে সরে গেল, কুয়াসাবৃতা পাতাবিহীন খাড়া খাড়া ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা আমড়া গাছ। তার নীচে উনুনের ঘুটের ছাইগাদা, একটা মুরগী তার বার, চৌদ্দোটা ছানা নিয়ে ছাই ঘেঁটে পোকামাকড় খুঁজে কুক্ কুক্ শব্দে ছানাদের ডাকছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছানাগুলো মুরগীটার অর্থাৎ তাদের মায়ের ঠোঁটে ছোট ছোট পাখা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আবার ধাড়ি মুরগীটা খাবার খুঁজছে। অদূরে একজন পুরুষ মানুষ, বেশ দীর্ঘ সাদা দাড়ি, বড় বড় চোখ, সাদা ছেঁড়া গেঞ্জি , ময়লা লুঙ্গী পরা, বাম হাতটা পিঠের পিছন দিয়ে লুঙ্গির নিচে চুলকাচ্ছে মনে হচ্ছে খোস বা পাঁচড়া কিছু একটা হয়েছে, ডান হাতে একটা সিক্ কাবাব ধরে দাড়ি ঘেঁসে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে আর চিবুচ্ছে। দূরে সরু রাস্তা হেঁটে চলেছে ৪৫ বছরের মহঃআলীম সাহেবের দুসরি বিবি। কলাতুন নেসা। অতি রুগ্ন, নয় মাসের (অষ্টমবার) গর্ভবতী সে, হাতে বাঁশের বানানো ঝুড়িতে আছে সেদ্ধ বিটি শাকিলার তিন নং আঁতুড়ের বাচ্চার ছেঁড়া কানি চুনি(নেকড়া) পুকুরে ধুতে যাচ্ছে। কলাতুন নেসার সতিন নাত্নিলাতুন নেসার বড় নাত্নি দুটো বাচ্চা কোলে ও একটা পাঁচ মাসের পেটে নিয়ে উথু চুল ছেঁড়া শাড়ী পরে কাঁদতে কাঁদতে নানির বাড়ি এসে জানালো তাকে তালাক দিয়েছে। ড্রপসিন পড়ল। লেখা আছে সমাপ্ত।

এত বড় দুঃসাহস কারও হয় নি, যে এমন উলঙ্গ মুসলিম সমাজের চরিত্র নাটক করে মঞ্চে উপস্থাপন করবে। কারণ আমরা দুধর্ষ ঘন জাতি বা ইউচী জাতি নয়। আমরা মিষ্টিভাষী, ধর্মনিরপেক্ষ, পরধর্মসহিষ্ণু, নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ ভারতীয় মানব জাতি।

বাবার কাছ থেকে সত্যতা ও দৃঢ় চরিত্র গঠনের আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছি। আমাদের পচা - ঘুন ধরা সমাজের বিধ্বংসী সামাজিক ঘটনা দেখতে দেখতে ক্রোধে, ঘৃণায় প্রতিবাদে ফেটে পড়লাম, কিন্তু প্রতিবাদের পথ কোথায়? বাবা প্রাইমারী বেসিক ট্রেনিং কলেজে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যের বাচ্চাদের মানসিকতা ও বর্তমান ভারতের বাচ্চাদের মানসিকতার উপরে ক্লাস নিতেন প্যাটেলনগরে জে. বি. টি কলেজে। আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করলেন বললেন এম. এ. পাশ করে বাড়িতে বসে সমাধান নেই। বেরিয়ে পড় রাস্তায়, দু চোখ মেলে দেখ, মেয়েদের অবস্থান কোথায়। তাদের মুক্তির পথ তৈরির কাজে নেমে পড়। আর সেটা হলো নারী শিক্ষার অঙ্গন।

আমি সে কাজ পারলাম না। আংগিকের দিকেরও প্রয়োজন আমার ছিল। তাই এনডিও

গুলিতে কাজ করতে শুরু করলাম। সেটাই আমার বড় পাওনা। এই কাজের অভিজ্ঞতার কথা আমি দুচার পাতায় লিখলাম। দরদি না হলে হাজার বছরের প্রাচীন এই ভারতবর্ষ ও তার জনগণ কোন দিনই প্রকৃত উন্নয়ন অর্জন করতে পারবে না। Development এর আক্ষরিক অর্থ হল উন্নয়ন। একটা খারাপ অবস্থা থেকে একটা ভালো অবস্থায় যাওয়া। আমাদের এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, অধিকাংশই গ্রাম নিয়ে তৈরি। আর এই গ্রামগুলির জীবন ভয়ানক ভাবে পিছিয়ে পড়া। এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে গ্রামগুলিকে, ক্রমউন্নতির দিকে টেনে আনতে সরকারি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন অ-সরকারি সংস্থাগুলোকে একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা নিতে হল?

সর্বপ্রথম সরকারের কথা বলা যেতে পারে; যেখানে সরকার গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার গ্রাম উন্নয়নের জন্য কত প্রকল্প তৈরি করল। বাস্তবায়িত করল। কিন্তু সঠিক নজরদারি ও পারম্পর্য অর্থাৎ মনিটারিং ও ফলো আপের অভাবে কোন সুপরিকল্পিত প্রকল্প স্থায়িত্ব পেল না। সরকার গ্রাম উন্নয়নের কাজে পরিকল্পনা তৈরী করল। গ্রামিন বিকাশের জন্য অফিস ফাঁকিয়ে জেলার সদর শহরে গড়ে তুলল কিন্তু যাঁদের জন্য এত কিছু করা সেই গ্রামের লোক জানতেই পারল না যে তাদের উন্নয়নের জন্য একটা বিশাল ব্যবস্থা রয়েছে। D.R.D.A থেকে শুরু করে D.I.C পর্যন্ত কত I.G. প্রকল্প আছে যা থেকে সাহায্য পেয়ে দক্ষতা আছে সেই কাজে এমন ছেলে মেয়েরা বা পুরুষ মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারে। এই প্রকল্পগুলো আছে ঠিকই কিন্তু এই খবর গুলোকে সঠিক জায়গাতে সরকার পৌঁছতে পারে না। অপর দিকে এই সমস্ত প্রকল্পগুলো থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে স্বনির্ভর যারা হতে পারে তাদের থাকতে হবে কিছু মূলধন সম্পত্তি অথবা থাকতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা। যেখানে আমাদের ভারতের বেশির ভাগই গ্রাম। আর গ্রামের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও গরিব সেখানে কি ভাবে ও কেমন করে ঐ ঋণ পেয়ে তারা স্বনির্ভর হতে পারে? এ প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় যে তাহলে কি আমাদের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় তেমন কেউ D.R.D.A বা D.I.E ঋণ নেয়নি? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই পেয়েছে ঋণ। কিন্তু যারা পেয়েছে তারা অধিকাংশই প্রধান সাহেব বা কমরেড বাবুর স্বজন পরিজন। যাদের কোন কাজের বা ব্যবসার দক্ষতাই নেই। D.R.D.A এর আসল অর্থ তারা বোঝেনি। আবার অন্য একটা শ্রেণীও এই ঋণ পেয়েছে । তারা হল অসামাজিক বা সমাজ বিরোধী লোক, কারণ প্রধান জানেন প্রধানের পদটাকে স্থায়িত্ব দিতে হলে এদের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাছাড়া ঋণের সাবসিডিটা তো ঐ প্রধানবাবুর পকেটে যাবে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর কিছু খারাপ ফল পাওয়া গেছে, (১) ঋণের টাকা হাতে পেয়ে বেশ কিছুদিন বসে বসে কাজ না করে ভালো খাবার খাওয়া যায়, ফলে ঋণ গ্রহিতা কর্মে আলস বা কর্ম বিমুখ হয়। (২) ঋণের বোঝা বাড়ে, (৩) ব্যাঙ্ক যখন দেখে ঋণ কোন ভাবে পরিশোধ হচ্ছে না তখন ব্যাঙ্ক পরবর্তী সঠিক যে প্রাপক তাকে ঋণ দেয় না। কিন্তু যাদের দক্ষতা আছে, তারা ঋণ নিতে গিয়ে আবেদন পত্র, প্রধানের সই, কোর্টের এফিডেভিট, D.I.E office এ ইনটারভিউ এই সব করতে গিয়ে যে নাকাল হন তাতে সময় নষ্ট, অর্থনষ্টি, ধৈর্য হারানো ও শেষ কর্মদক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে দিন মজুরে ফিরে আসার ঘটনাই ঘটছে । সর্বোপরি বলা যায় গ্রামের ৫ -১০ শতাংশ মানুষ এ ঋণ পেয়েছে কিন্তু অপাত্রে দান হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় Agriculture officer এর কথা অর্থাৎ A.D.O-র কথা। নিশ্চয় সরকার একজন করে A.D.O প্রতি ব্লকে দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামের বেশির ভাগ কৃষক জানেই না যে তাদের কৃষি কার্যের উন্নয়নের জন্য একজন Agriculture Development Officer আছেন।

এই রকম যেখানে অবস্থা তখন Government Organisation এর পাশা পাশি N.G.O গুলো নিজস্ব এক মৌলিক পরিকল্পনা নিয়ে, আন্তরিকতা থাকলে, rural development এর কাজ করা যায় কিনা সেটাকে পরীক্ষা মূলক ভাবেই নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা সরকারি ব্যবস্থা যেখানে এমন যে, কিছু ঋণ পেতে হলে কিছু মূলাবান সম্পদ থাকতে হবে, আবার এর সুদও গুনতে হবে। সেখানে N.G.O গুলো স্বদেশী বা বিদেশী ফান্ড থেকে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে যে সামান্য টাকা পেয়ে থাকে এই অল্প টাকা থেকে কি ভাবে গরিব থেকে গরিবতরদের স্বনির্ভর করা যায়, স্বল্প সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব বাড়ানো যায় একথা ভাবে।

Rural Development বা গ্রামোন্নয়নের কাজে সবার আগে আমাকে যেটা করতে হয়েছে, তাহোল "আমি তোমাদেরি লোক" এই ধারণাটাকে সেই গ্রামের মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া। আমি যখন বাঁকুড়ার নুড়ি পাথরের দেওয়াল ঘেরা নয়টি আদিবাসী গ্রামের উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়ে ছাতনা ব্লকেমালদিয়া অঞ্চলে এলাম ঠিক তখনই ঐ রামপুর গ্রামের জানালা বিহীন অন্ধকার একটা ছোট ঝুপড়ি ঘরকে অফিস ঘর বানালাম ও তার পাশেই অনুরূপ একটা ঘরকে নিলাম আমার বাস করার ঘর হিসাবে। আমার এই ভাবে থাকাকে কেন্দ্র করে ঐ গ্রামের পুরুষ মহিলা আদিবাসীদের অনেক জল্পনা জটলা পাকিয়েছে। দল বেঁধে এসে জিজ্ঞাসা করেছে নানা প্রশ্ন। কেন এলাম? তাদের ঘরে থাকতে পারব কিনা? ইত্যাদি কথা। প্রথম দিকে বেশ ভয় পেয়েছিলামই, কিন্তু পরে দেখলাম তাদের মন্তে বিশ্বাস যোগ্য কেউ নয়। তারা ভেবেছিল আমি পরদিন সকালেই শহরে ফিরে যাব। "এরা শহর থেকে আসা মানুষ, তাতে মেয়ে, বড় হিম্মত দেখাতে এসেছে, এমনি কতজনই এল আর গেল। গাড়ি চড়ে আসে পায়ে থাকে জুতো। তাদের পায়ের চামড়া বাঁকুড়ার গরম মাটির উত্তাপ কেমন জানলই না। তারা আবার আমাদের কষ্ট জানবে কি করে?" এই সমস্ত কথাগুলো আমার কানে এল। ভাবলাম, কেমন করে তাদের ভাবাতে পারি যে আমি তাদেরই লোক। রাত অনেক, খাবার নেই, অন্ধকার ঘরে একটা কেরাসিন বাতি জ্বালিয়ে ডায়রি লিখছি। একজন সাঁওতাল মহিলা জিজ্ঞাসা করল, "দিদিমুনি মাড্ডিলাদিঃ কারেঃ?" (ভাত রান্না করেছিস?)" আমার চুপ থাকা দেখে কিছুক্ষণ পরেই কিছু গরম মাড়ভাত ও শুকনো লাউপাতার তরকারি এনে বলল "মাড্ডি যম আঃ " (ভাত খেয়েনে) ভাবলাম তাদের লোক হবার এই এক সুযোগ। কষ্ট হলেও ভীষণ আনন্দ করে খেয়েছিলাম। ভোরবেলায় সমবয়সী সাঁওতাল মেয়েদের সাথে মাঠে যাওয়া, স্নানে যাওয়া, তাদের সাথে বসে খাওয়া, বাঁকুড়ার পলাশের জঙ্গলে কাঠ ভাঙতে যাওয়া, তাঁদের সাথে নিমতেল মেখে খোলা আকাশের নীচে ঘুমানো, তাদের ভাষা শেখা, বাহাপুজো, বাধনা উৎসবে নাচ দেখা ও নাচতে যাওয়া, এই সব কাজে যোগ দিতে নিজেকে তৈরী করলাম। ধীরে ধীরে এর এক সুফল দেখা গেল, পাশের

সাঁওতাল গ্রাম থেকে আলাপ করার জন্য আসত ওরাং সম্প্রদায়। ক্রমশ তারা আমাকে আপন ভাবতে শিখল। তারা তাদের অতীতের কথা বলত। ভাবলাম তাদের সাথে এক সেতু বন্ধন হয়েছে আমার। তখন আমার কাজ শুরু করার কথা ভাবলাম।

ঘন ঘন মিটিং শুরু করলাম তাদের সাথে; গ্রাম নিয়ে ভাবতে বললাম, গ্রামটা দেখতে কেমন, রাস্তা ঘাট, দোকানপাট, পাঠশালা, মন্দির, তাদের অবস্থান কোথায়। গ্রামের সমস্ত মানুষকে অংশ গ্রহণ করতে হলো গ্রামের চিত্রঅঙ্কনের কাজে, অর্থাৎ শুরু করলাম P.R.A (Participatary Rural Apprisal). P.R.A। এর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমি যেটা করিয়েছিলাম সেটা হল গ্রামের মানুষদের দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া। একটা দল গ্রামের ভিতরের অংশ দেখবে অপর দলটি গ্রামের বাইরের চিত্র দেখবে। দুটো দলকে এক জায়গায় এনে ঐ গ্রামের ছবি (Map) তাদের দিয়েই আঁকানো হবে।

পরস্পরের আলোচনায় তারা তাদের গ্রামের নিখুঁত ছবি এঁকে ফেলেছিল। গ্রামে কি আছে, কি নেই। কি থাকা উচিৎ ছিল, তারা নিজেরাই বলতে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, কৃষির অবস্থা কত করুণ নিজেরাই দুঃখের সাথে আলোচনা করতে থাকে। একটা আদর্শ গ্রামের চিত্র কেমন হলে ভালো হয় ঐ গ্রামবাসীরা নিজেরাই বলে। তাদেরকে দিয়ে শেষ করে ফেলি rank-ing (ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক অবস্থান কোথায়)।

P.R.A শেষ হলেই হয় ঘরে ঘরে সার্ভে। হয় Participatory rural plan. এই Plan কে কার্যকরি করতে হলে চাই একটা মাধ্যম। এই ভাবে গ্রামের লোকই গড়ে তোলে Community Base Organisation (C.B.O) গ্রামের লোক নির্বাচন বা মনোনয়ন করে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষর। এই ভাবে গ্রামের প্রতিটি ঘর জড়িত থাকে এই C.B.O. সাথে। Planning, Implementation. Monitoring. Evaluation. Organisation management. এর উপর ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাদেরকে লোনসিসটেম, ক্রেডিট সিসটেম ইত্যাদি শেখানো হয়।

গ্রাম উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে যে গুলো করতে হয় ঃ-

(১) সেই গ্রামবাসীদের সাথে বাস করা, তাদের সংস্কৃতি জানা ও আঞ্চলিক ভাষা জানা।
(২) তাদের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরি করা।
(৩) সচেতনতা বাড়ান।
(৪) স্থায়ী দক্ষতা বাড়ান ও নূতন দক্ষতা সৃষ্টি করা।
(৫) জোট বাঁধা।
(৬) সরকারী যত সুযোগ সুবিধা আছে তা যথা সম্ভব আদায় করা।

এই উপরোক্ত বিষয়গুলো করে "আমি তোমাদেরই - লোক" এই অনুভূতিটা গ্রাম বাসীদের মনে গেঁথে দিতে পারলেই আমার কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি গ্রামের লোক দিয়েই গ্রাম উন্নয়ন করা সম্ভব।

N.G.O হয়ে কাজ করতে এসে গ্রামের মানুষকে ভাবাতে পেরেছিলাম রাস্তা ঘাট, স্কুল,

স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তাদেরই। আর এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদেরই। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন সাবডিভিসনে কুলতলী ব্লকে পালতির চক বলে একটা গ্রামে কাজ করছি তখন। সেই গ্রামের মানুষ সমিতির সাথে জড়িত। গ্রামটা খুবই বিচ্ছিন্ন। বর্ষার দিনে বাদার জন্য গ্রাম থেকে বেরোনোর কোন উপায় থাকে না। তাদের আবেদন একটা রাস্তা করে দেওয়ার। গ্রামের লোকের আবেদনে সাড়া দিয়ে ঠিক হলো গ্রামের মানুষ মাটি দিয়ে উঁচু করে চার কি.মি. কাঁচা রাস্তা তৈরি করলে N.G.O থেকে ইটের রাস্তা করতে পারে। গ্রামের লোক স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় সকলে মিলে মাটি দিয়ে ৪ কিমি রাস্তা তৈরী করল, কথা মত N.G.O. থেকে ইঁট দিয়ে তৈরী হলো পাকা রাস্তা। এই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটাও তারা নিল। একদিন আমি একটা মিটিং-এ একটা গ্রামে যাচ্ছি, গ্রামে ঢুকতেই এক বয়ঃজ্যেষ্ঠর সাথে এক ১৪ বছরের তরুণের তর্ক শুনলাম। ঐ রাস্তা থেকে বেশ কয়েকটা ইঁট তুলে এনে বয়স্ক ভদ্রলোক দরমার বেড়া বানিয়ে ছিল। এ খবর জানতে পেরে তারই নাতি বাড়ি থেকে ইঁট এনে পুনরায় রাস্তায় বসাচ্ছে। তার বক্তব্য, এ রাস্তা আমাদের, আমিও মাথায় করে মাটি এনে দিয়েছি, তবেই না সুস্থ ভাবে স্কুলে যেতে পারছি, এ রাস্তা আমাদের কেউ এখান থেকে ইঁট তুলবে না।" সত্যি কারের দরদ আছে তাদের ঐ রাস্তার উপর; তাই রাস্তা ভেঙে যাওয়ার ভয় নেই।

আবার ঠিক কাছাকাছি অন্য একটা গ্রামের কথা বলছি। ঐ একই ব্লকের হরি ঘোষের চক নামে অপর একটি গ্রামের রাস্তার অবস্থা ঠিক একই রকম। বর্ষা কালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সেই সময় পঞ্চায়েত নির্বাচন, নেতারা মিটিং করতে এসে বললেন, "যদি আমাদেরকে এ নির্বাচনে জয়ী করতে পারেন তবে এ রাস্তাকে ইঁটের বানিয়ে দেব।" গ্রামের লোক এক জোট হয়ে ভোট দিয়ে জয়ী করল। নেতাদের কথা মত রাস্তাও তৈরী হলো। প্রথমে মাটি ও পরে ইঁট বিছানো দুটোই পঞ্চায়েত প্রধান করালেন, এতে গ্রামের লোকের কোন রকম অংশগ্রহণ করেনি। তাই রাস্তা রক্ষার দায়িত্বটাও গ্রামের লোকের, এ ধারণা তাদের ছিল না। তাই বছর খানেকের মধ্যেই ঐ ইঁট গুলো রাস্তায় না থেকে গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে বেড়া তৈরির কাজে লেগে গেছিল। এক দিন অঞ্চল প্রধান সাহেব বললেন"এই রাস্তা তোমাদের, এর দায়িত্বটা ও তোমাদেরই"। কিছু লোক বললেন, "আগামী নির্বাচনে প্রধান হবেন কি নিয়ে? ভোট দিয়েছি রাস্তা করেছেন, আবার ভোট দেব রাস্তা হবে।" এখানেই সরকারের সাথে N.G.O র তফাৎ। জনগনের দরজায় দরজায় পৌঁছে দিবা রাত্রি তাদের সাথে বসে তামাক খাওয়া থেকে রান্না ঘর পর্যন্ত একটা নিগূঢ় সম্পর্কের সেতু তৈরির সাথে গ্রামকে না জাগাতে পারলে rural development এর কাজ করা যায় না।

Agriculture development এর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুলতলী ব্লকের অধিকাংশ জমিই হচ্ছে নিচু জমি। এই জমি থেকে চাষীরা সারা বছরে এক বার ফসল পেয়ে থাকে। এই জমি থেকে কি ভাবে সারা বছর ফসল পাওয়া যেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা বের করা হল। আমরা দরিদ্র ও দরিদ্রতমদের নিয়ে কাজ করি, তাই যে চাষী প্রান্তিকে, তার একটা বিঘে দেড় জমির প্লট বেছে নিলাম। ঐ জমির ৫ কাঠাতে একটা ৯ ফুট গর্তের পুকুর খনন করা হল। পুকুরের পাড় ৫ ফুট। পুকুর কাটার মাটি ঐ নিচু জমির সমস্ত অংশটিতে দুই - ফুট উঁচু

করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ফলে নিচু জমিটা এখন মাঝারি জমিতে পরিণত হলো। এবার বলা যেতে পারে ঐ এক ফসলী জমি যা থেকে কৃষকের বার্ষিক আয় ছিল তিন হাজার টাকা, এখন ঐ একই জমি থেকে কি কি ফসল পাওয়া যেতে পারে দেখা যাক। সুন্দরবন সাবডিবিসনে প্রচুর চিংড়ি চাষ হয়। ঐ পাঁচকাঠার পুকুরে বাগদা, মোচা, গলদা চাষ করে ঐ চাষী বছরে নয় হাজার টাকা আয় করতে পারে। পুকুরের ঢাল অংশটাতে ঢেঁড়স, পুই শাক, কুমড়ো, বীন, লাউ চাষ করে সারা বছরে একটা ভাল টাকার অঙ্ক পেতে পারে অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা। সারা সছর বর্ষাকালীন, শীতকালীন ও গ্রীষ্ম কালীন সব্জী চাষ করে এই টাকা ঐ চাষী পেতে পারে। পুকুরের যে উঁচু পাড় রয়েছে তাতে পেঁপে, সবেদা ও কলা গাছ লাগানো যেতে পারে। যে জমিটাতে আগে একবার ধান চাষ হতো সেটাতে এখন পুকুর থাকার জন্য দুইবার ধান চাষ হবে। ফলে ধান চাষ থেকে চাষী দশ হাজার টাকা বছরে আয় করতে পারে। যে কৃষক বদ্ধ ট্রেডল পাম্প দিয়ে ২৫ - ৩০ ফুট নিচু থেকে জল তুলতে পারে, এই পাম্প ঐ পুকুরের এক অংশে বসিয়ে সহজেই চাষী জলসেচ দিতে পারে। এই পরিকল্পনাটা কামারের চক্ নামক একটা গ্রামের এক প্রান্তিক চাষীর জমিতে করে চাষীকে সারা সছরে উনিশ হাজার টাকা আয় করিয়েছিলাম। এর ফল স্বরূপ দেখা গেছে, প্রান্তিক চাষী থেকে ক্ষুদ্র চাষী ও বৃহৎচাষী সকলেই এই পরিকল্পনা নিজেদের ক্ষেতে সফল করেছে। কুলতলীতে যা land Scheme নামে পরিচিত। এখানেও ঐ একই ভাবে চাষীর বাড়িতে গিয়ে উৎপাদন করিয়ে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলাম। তাই বলতে পারি composite land development করে গ্রামের উন্নয়নের বড় অংশ সফল করা যেতে পারে।

এবারে অন্য এক উন্নয়নের কথা বলতে পারি। ফিরে এলাম আবার বাঁকুড়াতে সেই সাঁওতাল গ্রামে। কাজ করছিলাম (Indian Mahila Yoyana) I. M.Y দিয়ে। মহিলাদের নিজেকে চেনা, জানা, ও আপন ক্ষমতা অর্জন করার উপরে কাজ করতে গিয়ে প্রথমে যেটা হয়েছিল সেটা হলো, একটা বেশ ভাল খাবারের ব্যবস্থা করে ৫০-৬০ জন সাঁওতাল মহিলাদের ডেকে মিটিং করেছি। প্রথমেই আমি বলেছিলাম, "মহিলারা আজ এতদিন পরেও যে তিমিরে সেই তিমিরে। তারা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, ধর্ষিতা, কলঙ্কিতা।" আমার কথা শেষ না হতেই অঞ্জনা বেসরা নামে এক মেয়ে বলেছিল, "দিদিমনি গো, আমরা যে "তা" সম্প্রদায় এ কথা ভাল করে জানি গতর খাটিন খাই, কোলের ছেলে কাঁখে নিয়ে মাঠে যাই, ধান কাটি, মাটি কাটি, কাঠ ভাঙি, রান্না করি, সবাইকে খেতে দিই, মাতাল মরদ ঘরে এসে ঝগড়া করে, আবার শেষে মারও খাই গো দিদিমনি, মরদ বটে তারা, আমাদের মেরেই তো তাদের মরদানি - মিটিং করে কি হবেক, এই মাঠে চললাম খাটতে যাবি তো আয়।" সেদিন আর মিটিং হয়নি। ভেবেছিলাম, যারা এত জানে তাদেরকে কেমন করে এক করা যায়। একদিনের এক ঘটনার কথা বলি, পাহাড়ী কোল গ্রামের মেয়েরা অগ্রহায়নের ধান কাটার পর মাঠে ইঁদুর শিকার করতে বেরিয়েছে, আমিও তাদের সাথে মাঠে গেলাম। তারা বেশ কতকগুলো ইঁদুর মারতে পেরেছে, তাদের সাথে মাঠে বসে কথা বলছি। সারা দিন তারা কতই না পরিশ্রম করে। বিকালে ফিরে এলাম আমার সেই রামপুরের ঘরে। এসে দেখি, আমার বাড়িওয়ালির ৯ বছরের ছেলে সুশান্ত, আমারই খাবার থালাতে একটা ইঁদুর পুড়িয়ে পৈয়াজ লঙ্কা দিয়ে মাখছে। আমি চিৎকার করে উঠে বলছি "এই সুশান্ত তুই

আমার থালাতে ইঁদুর রেখেছিস কেন?" সুশান্ত সাবলীল ভাবে উত্তর দিল, "এই ইঁদুর পোড়া তোকে দেব না? মা তোর জন্য রেখেছে।" সুশান্তর মা বলল "তোর তো ভাগ আছে তুই তো আমাদের সাথে মাঠে ছিলিস ইঁদুর মারতে। আজকে মেয়েরা বলছিল তোর সাথে মিটিং করবে গো 'আইমান হর সমিতির মিটাও'। ইঁদুর পোড়া খাইনি ঠিকই, কিন্তু এই ইঁদুর শিকারকে কেন্দ্র করেই, ঐ একগুঁয়ে , এক রোখা মেয়েগুলোকে এক জায়গাতে বসাতে পেরেছিলাম। একটা ধারণা ছিল যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে ভীষণ একতা। কিন্তু না; এদের মধ্যে আছে ঐ একই ইগো, কেউ কাউকে সহ্য করে না। তবে স্বার্থে টান পড়লেও অন্যের ভয়ানক ক্ষতি করে না। এই মেয়েদের সাথে বসেছি একাধিকবার। যারা সারাজীবন দিন মজুরি খেটেছে তারা অভাবের জন্য একটা পয়সাও নিজের বলে রাখতে পারেনি; কিন্তু শত অভাবে থাকলেও দুইবেলা রান্না হয়। তাদের বলেছিলাম ঐ রান্নার চাল থেকে দুই বেলা দুই মুঠো চাল তুলে নিলে কারোর অন্ন কমে যাবে না বা বেড়ে যাবে না। সাঁওতাল মেয়েরা আমার কথা শুনে মুঠোর চাল তুলে রাখত গোপনে একটা হাঁড়িতে। তারা মাসের শেষে মিটিংএর দিনে আপন আপন চালের হাঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, মাসের শেষে কেজি ২ চাল ও ১০টা টাকা তারা প্রত্যেকেই জমাতো। যদি সাক্ষরতার কথা বলি তবে এখানেও আছে একটা উদাহরণ। ঐ পাহাড়ী কোলের মেয়েদের বলেছিলাম ছেলেরা বড় চালাক, কোন না কোনভাবে নিজের নামটা তারা সই করতে জানে কিন্তু তোমরা তোমাদের নামের কয়টা অক্ষর হয় সেটাও জান না" এ কথা শুনে ৪৫ বছর বয়সের এক মহিলা বলল "এ বয়সে পড়তে লারব দিদিমুনি" নাম তার পুবিবালা মুর্মু। কিন্তু ওরাই আজ একটা NFE Center চালায়। অঞ্জনা বেসরা, রামপদ টুডু এরা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা। ঐ ৪৫ বছরের পুবিবালা এখন ইংরেজিতে নাম সই করে।

এই সমিতির মেয়েরা তাদের স্বামীদের ভাটিখানার মদের হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে এসেছে। কোন মেয়ের উপর মাতাল মরদ অত্যাচার করলে এরা দল বেঁধে প্রতিবাদ করে। পাহাড়ী কোল গ্রামের মহিলা সমিতির কথা পাশা পাশি সাঁওতাল গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। তাই, রামপুর, সুরাল ডিহা, গোদাতোড়া, কেন্দ বোনা, জটার ডিহি, মাসথোল, মাল ডাঙ্গরা গ্রামের মেয়েরা আপন আপন গ্রামে মহিলা সমিতি গঠনে ভূমিকা নিয়েছে। এখন আর আমাকে মিটিং ডাকতে হয় না, ওরা ওদের প্রয়োজনে নিজেরাই মিটিং ডাকে, মুঠের চাল সংগ্রহ করে, বিক্রি করে, টাকা ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে জমা করে। আমাকে তাদের একত্র করার জন্য মাঠে জঙ্গলে যেতে হয় না তারাই আমাকে ডাকে। এখন তাদের দিয়ে I.M.Y এর যে কোনো Self development এর কাজ করা যেতে পারে। এই ভাবে আমি আমার rural development এর কাজে কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

'বীরভূমে পোড়ামাটির ইতিহাস'

নীতা সেনগুপ্ত

অবিভক্ত বাংলার অসংখ্য মন্দির মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমস্ত মন্দির বাংলার বিভিন্ন স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকাল অর্থাৎ খ্রিস্টিও পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে ব্যাপকভাবে নির্মিত হলেও তার অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে। প্রায় কয়েক শো বছর ধরে ইঁট নির্মিত অসংখ্য মন্দির বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেলেও, যে গুলি অবশিষ্ট আছে তার সংখ্যাও কম নয়।

মধ্যযুগীয় বাংলায় বিভিন্ন মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে, উচ্চশ্রেণীভুক্ত মানুষের মত নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাও যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করত, তেমনি আবার এই সমস্ত মন্দিরে বিভিন্ন পূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শিবরাত্রি, দোল প্রভৃতি উপলক্ষে জাতি নির্বিশেষে মানুষের সমাগম ঘটার ফলে উচ্চ এবং নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সমন্বয় হত্তে। ওই সব পূজাপার্বন উপলক্ষে বিভিন্ন জাতির মানুষ মন্দিরের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতো, যেমন ব্রাহ্মণ পৌরোহিতের কাজে, মালাকাররা ঠাকুর সাজানোর কাজে, পুষ্পচয়ন ও গাঁথার কাজে নাপিত ও তাঁতিরা এবং ঢাক ও কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য বাজানোর কাজে ডোম। ফলে এই মন্দিরগুলি ব্যক্তি বিশেষের না হয়ে সর্বজনীন মন্দির হিসাবে পরিগণিত হতো।

বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামের ১৭০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে তৎকালীন সমাজে মন্দির প্রতিষ্ঠা একটি সামাজিক ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত হতো। এই সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের যুগান্তকারী প্লাবন বাংলার শিল্পকে এক নূতন আলোয় আলোকিত করে। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থারও ক্রমোন্নতি ঘটে। তারা সমাজের উচ্চশ্রেণী ভুক্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের ন্যায় সমসামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ফলে স্থানীয় ভূস্বামী, রাজা জমিদার ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যেমন বণিক সম্প্রদায়, অ-জলচল কোন কোন অন্ত্যজ শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যক্তিরাও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি প্রকাশ পেত। এছাড়াও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামদেবতা বা স্থানীয় দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতার সম্মান-ও বৃদ্ধি পেত।

এই সকল মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকে পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনীর মাধ্যমে শিল্পীর ভাস্কর্য শৈলীরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই ইঁট নির্মিত মন্দিরাদিকে স্থাপত্যের ভিত্তিতে সাধারণত চালা (চারচালা বা আটচালা) রত্ন (একরত্ন বা পঞ্চরত্ন), অষ্টকোনাকৃতি, দেউল (রেখদেউল বা পীড়াদেউল), মাথ (যা কেবল বাংলাদেশে দেখা যায়) প্রভৃতি ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই এক একটি মন্দিরকে পুনরায় পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে, ভিত্তি, জংঘা, শিখর, কলস ও পতাকাদন্ড, প্রায় প্রতিটি মন্দিরের জংঘা প্রদেশ কমবেশি পোড়া মাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত।

এই ফলকগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির বিভিন্ন ঘটনাবলী শিল্পী সুনিপুণতার সঙ্গে উৎকীর্ণ করেছেন। শিল্পীর হাতের সূচারু স্পর্শে বিভিন্ন দৃশ্য যেমন রামের বনবাস, অশোক কাননে সীতা, রাম রাবণের যুদ্ধ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা ও দশাবতার প্রভৃতি রূপ পেয়েছে।

এ ছাড়াও সামাজিক দৈনন্দিন জীবনের চিত্রও বিভিন্ন ফলকে প্রতিফলিত হয়েছে। অভিজাত পরিবারের অন্দরমহলে নারী প্রসাধনের দৃশ্যও যেমন ধরা হয়েছে, তেমনি হ্যাট বুট পরিহিত বিদেশি সাহেব হাতে জপমালা ও কমন্ডলু নিয়ে অশ্ব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। একটু নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম অর্থাৎ খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মন্দিরাদিতে তেমনভাবে বিদেশি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের মন্দিরাদিতে বিদেশি প্রভাব ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেমন দুবরাজপুরের একটি শিব মন্দিরের জংঘা প্রদেশে একজন ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলার আবক্ষ মূর্তি সুনিপুণতার ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

আবার অপর একটি ফলকে নীলকর সাহেবদের নারীর প্রতি আসক্তি ও নির্মম অত্যাচার শিল্পী তার অসাধারণ নিপুণতায় ব্যক্ত করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকর সাহেবদের অত্যাচার যেমন আমাদের মনে সাহেবদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয় ঠিক তেমনি এই নির্দিষ্ট ফলকটি আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে এবং মনে সাহেবদের অত্যাচারের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বীরভূমে নীলকর সাহেবদের বহু কুঠির নিদর্শন আজও বর্তমান। এই সুনির্দিষ্ট ফলকটিতে স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে একটি সাহেব একটি নারীর বস্ত্র হরণ করছে এবং তাকে সাহায্য করছে অপর একটি দাড়িওয়ালা পুরুষ, যাকে ভারতীয় বলে চিহ্নিত করা অতি সহজ, এবং অসহায় মহিলাটি প্রাণপণে নিজ লজ্জা নিবারনে সচেষ্ট। তাঁর চোখে মুখে অদ্ভুত এক ভয়ার্ত দৃষ্টি। এখানে আমাদের অবাক হবার পালা শিল্পী তাঁর কি সুনিপুণ শৈল্পিক গুণে এই দৃশ্য যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এই সময় কত যে নিষ্পাপ নারী এই অত্যাচারী সাহেবদের দ্বারা নির্যাতিতা হয়েছেন তার একটি ঐতিহাসিক দলিল এই ফলকটি।

এই রকম বহু ঘটনাবলী এই সকল মন্দিরের ফলক থেকে পাওয়া যায়। যার সাহায্যে তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই ঐতিহাসিক সুসজ্জিত মন্দিরগুলি আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। কিন্তু সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই মন্দিরগুলি ভগ্নদশায় জর্জরিত, যার দায়ভার বহুলাংশে আধুনিক সমাজ জীবনকেই বহন করতে হবে। বর্তমানে বহু মানুষ তাদের বাসস্থান সুশোভিত করার জন্য মন্দিরের ফলকাদি ব্যবহার করছেন। যা দীর্ঘকাল চললে আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে কোন ঐতিহাসিক নজির পেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। তাই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত কর্তব্য, — যা সহস্রাব্দের প্রজন্মের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে।

অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এখন বিশেষ আলোচিত নাম। তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ এবং বিকাশের তত্ত্ব তাঁরই লেখনীতে প্রকাশ করা হলো। মতামত ও আলোচনা চিন্তাশীল পাঠকের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে।

স.অ.

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
প্রথম দশক ঃ ১৯৭৬-১৯৮৬

মুহাম্মদ ইউনুস

কিভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সুরু হলো

১৯৮৬-তে দশ বছর পূর্ণ হলো গ্রামীণ ব্যাঙ্কের। দশ বছর আগে জোবরা গ্রামে যখন ভূমিহীনদের ঋণ দেবার চেষ্টা সুরু করি তখন ধারণাই ছিল না যে এ-চেষ্টা কয়েক বছর পর একটা ব্যাঙ্কের অবয়ব নেবে। ছোট একটা স্থানীয় উদ্যোগ হিসেবেই সুরু করেছিলাম। ব্যাঙ্কের কাছে গিয়েছিলাম একটা সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য। ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারলাম আমার সমস্যাটি স্থানীয় মোটেই নয়। আমার সমস্যাটির সমাধান করতে হলে পুরো ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে উল্টো করে সাজাতে হবে।

জোবরা গ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হলেই জোবরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যেতে হয়। গ্রামের রাস্তা বেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পৌঁছতে হয় বলেই গ্রামের সঙ্গে পরিচয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আজও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ জন ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে জোবরা গ্রামের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে উঠেনি। মাঝে মাঝে কোন উত্তেজনাকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় আর গ্রামকে মুখোমুখি হতে দেখি। কিন্তু দু'টো এক হয়ে কোন কাজে এগিয়ে এসেছে এমন ঘটনা ঘটেনি।

১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে আমি জনতা ব্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গিয়েছিলাম জোবরার কয়েকজন ভূমিহীন ব্যক্তির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে। সে ঋণের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। বহুদিন দরবার করার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে জামীনদার হয়ে সে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই প্রথম অভিজ্ঞতা হলো ব্যাঙ্ক বিনা জামানতে ঋণ দেয়না। ফলে ভূমিহীন জগগোষ্ঠীর পক্ষে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রমে অভিজ্ঞতা হলো শুধু ভূমিহীন নয়, ব্যাঙ্কের নিয়মকানুনের ফলে যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁরাও ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ কারবার করতে পারেন না। মহিলাদের সঙ্গেও ব্যাঙ্কের দূরত্ব প্রচুর। অথচ বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখলাম জামানত দিয়ে যে—সব ঋণ দেয়া হচ্ছে তার পরিশোধের ইতিহাস মোটেই সুখের নয়। যাঁরা ঋণ পান তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যাঁরা নিম্নবিত্তের তাঁদের ঋণ পরিশোধ করার প্রবণতা অন্যদের চাইতে ভালো।

আমি চেষ্টা করলাম যে—ভূমিহীনদেরকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহ করে দিলাম তাঁদের ঋণ পরিশোধের রেকর্ড যেন ত্রুটিহীন করে চালানো যায়। ফলে জামানতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সহজেই একটা প্রশ্ন তোলা যাবে। কিন্তু গরীব লোকের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করার

উপায় কি?

প্রথম বুদ্ধি আসলো যে ছোট ছোট ঘন ঘন কিস্তির মাধ্যমে টাকা আদায় করতে হবে। দৈনিক কিস্তির ব্যবস্থা করলাম। তারপর বুদ্ধি আসলো তাদেরকে সব সময় চোখের কাছে রাখতে হবে। চোখের আড়াল হতে দিলেই টাকা ভাংচুর হবার সম্ভাবনা। সমবায় সমিতির মত করে সাপ্তাহিক সভার ব্যবস্থা করলাম। সাপ্তাহিত সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা করলাম। তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক তদারকীর জন্য প্রাথমিক কাঠামো হিসেবে ঋণ ভিত্তিক গ্রুপ এবং তার ভেতর আরো ঘনিষ্ট তদারকীর জন্য 'মিউচুয়াল এইড সেল' করলাম। এগুলি বেশীদিন টিকে নি। পরবর্তীতে এগুলি ভেঙ্গে সমমনাদের গ্রুপ (৫ থেকে ১০ জন নিয়ে) বানালাম। দৈনিক কিস্তির স্থলে সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলাম।

নিয়মনীতি যতই নিত্যনতুন করতে থাকি না কেন, পরিশোধ সঠিকভাবে চলতে লাগলো। আমিও নতুন নতুন ঋণ নিয়ে ভূমিহীনদের দিতে লাগলাম। ব্যাঙ্ক আপত্তি তুলতে পারলো না... যে হেতু পরিশোধের ব্যাপারে কোন অনিয়ম নাই। কিন্তু ঋণ পাশ করানো একটা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। এক একটা ঋণ প্রস্তাব পাশ করাতে চার মাস, ছ'মাস সময় লেগে যেতো। ঢাকায় জনতা ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় থেকে পাশ করিয়ে আনতে হতো।

এ-ব্যবস্থার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। ঢাকায় একদিন কৃষি ব্যাঙ্কের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি অভিযোগ করলেন একাডেমিসিয়ানরা শুধু বক্তৃতা দেয়, আসল কাজে তাঁদের পাওয়া যায় না। যেমন ঃ কৃষি ব্যাঙ্কের এত সব জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য তিনি কারো কোন পরামর্শ পাচ্ছেন না। আমি প্রস্তাব দিলাম এত জঞ্জাল যেহেতু আমাকে দিয়ে পরিষ্কার করানো যাবে না... আমাকে বরং একটা শাখা তিনি বানিয়ে দিন জোবরায় (যেখানে আমি নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো)। যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা জামানতে ঋণ দেয়া, কৃষি ছাড়াও অন্যান্য অকৃষি খাতে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। আমি বল্লাম যে কৃষি ব্যাঙ্কের নামকরণটাই ঠিক হয়নি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শুধু কৃষি কাজই হয় এই ধারণা নিয়েই কৃষি ব্যাঙ্ক করা হয়েছে। অথচ কৃষি ছাড়াও বহু ধরনের অকৃষিজাত কাজ গ্রামে সংগঠিত হয়। তার জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে প্রস্তুত নয়। আমি বল্লাম আপনারা এর নাম পাল্টে দিয়ে 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' করুন। তাহলে এটা দেশের বহু উপকার আসবে।

আমার প্রথম প্রস্তাবে, অর্থাৎ জোবরায় একটা শাখা বানিয়ে সেটা সম্পূর্ণরূপে এক বছরের জন্য আমার হাতে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

এই আলোচনার সূত্র ধরে জোবরায় কৃষি ব্যাঙ্কের একটা সাব অফিস খোলা হলো। শাখা খুলতে তিনি সক্ষম হলেন না... তাঁর সহকর্মীদের আপত্তির কারণে। আমি সে সাব—অফিসের নাম দিলাম 'পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা'। এর নিয়মকানুন নির্ধারণ, লোক নিয়োগ, ঋণ অনুমোদন সব কিছুর দায়িত্ব পেয়ে গেলাম আমি। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস থেকে একটা চালু হয়ে গেলো।

ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে আমার বিরোধ চলতে রইলো। আমি যতই দাবী করি যে বিনা জামানতে গরীবদের ঋণ দেয়া যায়, ব্যাঙ্কাররা ততই বল্লেন যে বিনা জামানতে ব্যাঙ্কিং করা যায় না। আমি যতই বলি, দেখুন জোবরা গ্রামে কি রকম সুন্দরভাবে বিনা জামানতেরই ব্যাঙ্কিং চলছে... তাঁরা

ততই বলেন একটি মাত্র গ্রামে একজন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এরকম অস্বাভাবিক কাজ হলেও হতে পারে, কিন্তু সারা দেশে এটা চলবে না।

এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে উঠলো তখন আমাকে চ্যালেঞ্জের মত করে বলা হলো... যদি আপনি নিশ্চিত হন যে এটা চলবে তবে একটা পুরো জেলায় সেটা করে দেখাতে হবে।

১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর জনাব এ কে গঙ্গোপাধ্যায় একটি মিটিং ডাকলেন বিষয়টি বিবেচনার জন্য। রাষ্ট্রায়ত্তকরণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এবং কৃষি ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের এই সভায় ডাকলেন। সেখানে স্থির হলো বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের প্রকল্প হিসেবে একটি জেলায় জোবরার অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করা হবে। আমি বিশ্ববিদালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে এই প্রকল্প পরিচালনা করবো।

১৯৭৯ সনের জুন মাসে বিশ্ববিদালয় থেকে ছুটি নিয়ে টাংগাইল চলে গেলাম। ঐ জেলাতেই এই প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সুন্দরভাবে প্রকল্প এগিয়ে গেলো। আদায়ের হার শতকরা ৯৮/৯৯-এর মধ্যেই থাকলো। কিন্তু যেরকম উৎসাহ সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি থেকে আশা করেছিলাম। সেরকম উৎসাহ দেখা গেলো না। তাঁরা বল্লেন খরচ বেশী পড়ে। ইফাদ থেকে একটা ঋণের ব্যবস্থা করলাম খরচ কমানোর জন্য। এর সঙ্গে ঢাকা, রংপুর, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রকল্প সম্প্রসারণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সবাই বল্লেন আমার ব্যক্তিগত নিবিড় তদারকী না-থাকলে প্রকল্প চলবে না। দূরের জেলায় প্রকল্প সম্প্রসারিত করে দেখতে চাইলাম কথাটি সত্য কিনা। দূরের জেলায় প্রকল্প যদি ঠিকমত চলে তাহলে আমার নিবিড় তদারকীর ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না।

আমার সংগে কথা ছিল প্রকল্প সঠিকভাবে চললে সব ব্যাংক এটা তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করবেন। প্রকল্প ঠিকমত চলতে থাকলো কিন্তু কোন ব্যাংকের পক্ষ থেকে এটা নিজস্ব কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রস্তুতি দেখা গেলো না। আমার এখন ভয় হলো আমি বিশ্ববিদালয়ে ফিরে যাবা মাত্রই পুরো জিনিসটা গুটিয়ে ফেলা হবে, কিংবা বিকৃত করে ফেলা হবে।

আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ব্যাংকের নিকট প্রস্তাব দিলাম গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেবার জন্য। এর মালিক থাকবেন এই ব্যাংকেরই ভূমিহীন ঋণ গ্রহীতাগণ। প্রথমে তাঁরা এটাতে বেশী গুরুত্ব দিলেন না। পরে আমার আগ্রহের কারণে সেটা ব্যাংকার্স মিটিং-এ পেশ করা হলো। সবাই একবাক্যে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ব্যাংকার্স মিটিংএ আমি প্রস্তাবটি আবার পেশ করার ব্যবস্থা করলাম। সকল ব্যাংক বল্লেন আরো একটি ব্যাংক বানানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা এই প্রকল্পকে সমস্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আরো দেবে। কিন্তু পৃথক ব্যাংক করার কোন কারণ নাই।

কিছুদিন পর ভিন্ন ভংগীতে, অর্থাৎ পুরোপুরি ভূমিহীনদের মালিকানায় এই ব্যাংক না করে সরকারের সংগে মিলে এই ব্যাংক করার একটা প্রস্তাব অর্থমন্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলাম। মালিকানা

প্রস্তাব করেছিলাম ৪০ ভাগ সরকারের, ৬০ ভাগ ভূমিহীনদের। অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব সহানুভূতি দেখালেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বল্লেন। তাই করলাম।

১৯৮৩-র সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারী হলো। কিন্তু মালিকানা পাল্টে গেল। ৬০ ভাগে রইলো সরকারের হাতে, ৪০ ভাগ রইলো ভূমিহীনদের কাছে। আমি বল্লাম, ভবিষ্যতে যখন সুযোগ হবে তখন সরকারের শেয়ার ভূমিহীনদের নিকট বিক্রি করার জন্য আমরা আবেদন জানাবো। সরকার পক্ষ থেকে বল্লেন যে সেটা পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

প্রকল্প থেকে ব্যাংকে রূপ নিলো ৮৩-র অক্টোবর ২ তারিখে।

'৮৬ সালের সমাপ্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা দাঁড়িয়েছে ২৯৫-তে। পাঁচ হাজারেরও বেশী গ্রামে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে সর্বমোট ১৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগই মহিলা। ঋণগ্রহীতাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধের হার এখনো শতকরা ৯৮।

গ্রামীণ ব্যাংক কেন?

ধরে নেয়া হয় গরীব মানুষ তার আয় বাড়াতে অক্ষম যেহেতু উপার্জন করার মত্রে কোন কাজে তার দক্ষতা নাই। তিনি শুধু তাঁর দৈহিক শ্রম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। তাঁর উপার্জনক্ষম করার জন্য প্রথমেই হবে একটা কিছু দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার। এই প্রশিক্ষণ ব্যতীত একজন গরীব মানুষ একটা মাটির ঢেলার মত। এর কোন কদর নাই। বাজারে তার কোন দাম নাই। যেহেতু ব্যাপকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলে একটা রাষ্ট্রীয় আয়োজন লাগে, এবং সেটা হয়ে ওঠে না, ফলে তাঁদেরকে বেকার অবস্থায় বিনা উপার্জনে দিন কাটাতে হয়।

গরীব মানুষের উপার্জন করার ক্ষমতা নাই এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। উপার্জনই যদি করতে না-পারে তবে গরীব মানুষ বেঁচে আছে কি করে?

গরীব মানুষ তাঁর নিজের দক্ষতা এবং পরিশ্রম দিয়ে যে শুধু নিজেই বেঁচে-বর্তে আছে তাই নয়, বরং তাঁর দক্ষতা এবং পরিশ্রমের ফসলে অন্যদের গোলাও ভর্তি হচ্ছে। সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা বৃহৎ অংশ সৃষ্টি হয় গরীবের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে। কিন্তু অর্থনীতির পাতায় সেটা সেভাবে স্বীকৃত হয় না। গরীব মানুষ তাঁর উৎপাদন থেকে ন্যায্য অংশ তাঁর নিজের জন্য রাখতে পারেন না। এর বৃহত্তর অংশ অন্যের নামে লেখা হয়ে যায়। গরীব মানুষকে জীবন ধারণের জন্য এমন এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয় যে উপার্জনের ভাগ নিয়ে শক্তিধরদের সংগে তর্ক-বিতর্ক করার অবকাশ থাকে না। যা পান তা দিয়ে চলার চেষ্টা করেন। তাছাড়া শক্তিধরেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো চারদিকে এমনভাবে খাড়া করে রেখেছেন এর মধ্যে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ গরীবের জন্য নাই। গরীব মানুষ তাঁর চারদিকে যা যেভাবে দেখে এসেছেন সেটাকেই উচ্চবাচ্চ্য না-করাই বুদ্ধিমানের পন্থা হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

উপার্জনের ন্যায্য ভাগই যে শুধু গরীব মানুষ পাচ্ছেন না তা-ই নয়। তাঁর যে দক্ষতা আছে সে দক্ষতাকে তিনি পুরোপুরি কাজেও লাগাতে পারেন না। তিনি কৃষি কাজ জানেন, কিন্তু সারা বছর কৃষি কাজ করার তাঁর সুযোগ নাই। যে ক'দিন গৃহস্থ তাঁকে কাজে খাটাবেন, শুধু সে ক'দিন

তিনি কাজ করতে পারবেন। যতটা শ্রমঘণ্টা তাঁর কাজে মজুত আছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি প্রকৃত কাজে ব্যবহার করতে পারেন। বাকীটা নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম নষ্ট হয়ে যায় বলেই তিনি যেকোন মূল্যে সেটা বিকিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যান। এজন্যেই আজও বাংলাদেশে পেটেভাতে, বিনামজুরীতে, কিংবা আধাসের চালের বিনিময়ে দৈনিক শ্রমিক পাওয়া যায়।

গরীব মানুষ কৃষি বহির্ভূত হাজারো কাজ জানেন। নিজের দৈনন্দিন জীবনে, উপার্জন উপলক্ষে, কিংবা জীবন ধারণের উপলক্ষে এই দক্ষতার কিছু অংশ তিনি কাজে লাগান। তিনি তাঁর সমগ্র দক্ষতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন না কারণ তাঁরে কাছে কোন পুঁজির ভিৎ নাই। পুঁজির ভিৎ ছাড়া যে দক্ষতা সেটা পুঁজিওয়ালার ইচ্ছা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার মত পুঁজির ভিৎ যদি গরীবের আয়ত্বে আনা যেতো তবে তিনি তাঁর দক্ষতা পূর্ণ ব্যবহারের দিকে এগুতে পারতেন। সংগে সংগে তিনি নিজের ক্রমাগত সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির একটা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতেন। সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে পুঁজির ভিৎ প্রশস্ততর এবং গভীরতর হতো, ফলে দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন আরো বাড়তো।

একারণেই গরীবের কাছে ঋণ এত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের মারফৎ তিনি পুঁজির ভিৎ রচনা করতে পারেন। এজন্যেই, যে-মহাজন উপার্জনশীল কাজের জন্য ঋণ দেন, তিনি দৈনিক শতকরা দশ টাকা হারে সুদ নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন।

ঋণ মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার

অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু সমাজের বিত্তবান অংশই ঋণ নিতে পারেন। বিত্তহীনদের প্রবেশাধিকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নাই। এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে বিত্তহীনদের সংগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক লেনদেনের কোন ভিত্তি নাই। অর্থাৎ বিত্তহীন জনগোষ্ঠী কোন জামানত দিতে পারেন না। জামানতই যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে তেলামাথায় তেল দেয়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করলে মোটেই অযৌক্তিক হবে না।

ঋণকে অর্থনৈতিক শাস্ত্রে অত্যন্ত নিরীহ একটা ভূমিকায় চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে লেনদেনকে মসৃণ করে, তৈলাক্ত করে। এটাতে একটা সহযোগী ভূমিকা আরোপ করা হয়েছে। এরকম কল্পনা কেন শাস্ত্রকারগণ করেছেন সেটা তাঁরাই বুঝেন। হয়ত তাঁরা আসল ভূমিকা ধরতে পারেন নি, অথবা তাঁরা ইচ্ছা করে প্রকৃত ভূমিকা গোপন করে গিয়েছিলেন। আমি ঋণকে একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকায় দেখি। ঋণ একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক অস্ত্র। সঠিক ঋণনীতির মাধ্যমে এবং লাগসই ঋণ-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে একটা নির্দিষ্ট চেহারার দিকে নিয়ে নেওয়া যায়। ঋণ একজন মানুষের জন্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার সৃষ্টি করে। যিনি যত বেশী ঋণ আয়ত্বে আনতে পারেন তিনি তত ক্ষমতাবান। আজকের দিতে জরীপ করে যার হাতে যত ঋণ আছে দেখা যাবে তার থেকে নিশ্চিত করে বলা যাবে এবং আগামীকাল কার হাতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতটুকু থাকবে। এবং কারা এর থেকে বঞ্চিত হবে।

বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে সকল ঋণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে উৎসারিত সেখানে ক্ষমতা বন্টন রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্য থেকেই, জন্ম নেয়। ঋণের মাধ্যমে সম্পদের

উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়া হলো বটে, কিন্তু শর্ত থাকে যে এই নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করার কোন ঐতিহ্য বাংলাদেশে সৃষ্টি হচ্ছে না। যিনি যত বড় তিনি তত বড় সম্পদ ঋণের মাধ্যমে আত্মসাৎ করে রেখেছেন এবং রাখছেন। এর ফলে সমাজে কি ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে সেটা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। যেদেশে এক ইঞ্চি জমির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপন সহোদরের মাথা ভাঙতে কেউ দ্বিধা করে না, এক ব্যক্তির সম্পদ আরেক ব্যক্তি নিতে গেলে লাঠালাঠি হয়, সেদেশে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোপাট করা যেন সকলের নাগরিক অধিকার বলে আমরা ধরে নিয়েছি। যে যত বেশি লোপাট করতে পারে সে-ই তত নমস্য ব্যক্তি, জাতীয় বীরপুরুষ।

জামানতই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের একমাত্র ভিত্তি এটা গরীবদের ঠকানোর একটা কৌশল মাত্র। জামানত ছাড়া ব্যাঙ্কিং হবে না, এটা বলা আর পাখা না-থাকলে উড়তে পারবে না বলা একই কথা। মানুষের চাইতে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণী দ্বিতীয়টি নাই। মানুষ কোন দিন আকাশে উড়তে পারবে এটা যেকোন সুস্থ মস্তিস্কের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন ছিল। সে মানুষই এখন দিব্যি নানা দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে শুধু নয় তার মধ্যে আবার হাজার রকম খেলা দেখাচ্ছে। এই প্রাণীর জন্য যদি বলা হয় জামানত ছাড়া ব্যাঙ্কিং করার বুদ্ধি এদের মাথায় নাই, তার চাইতে হাসাকর বিষয় কি হতে পারে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত ঋণ মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। ঋণের মারফৎ একজন মানুষ অর্থনীতির কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে রণসজ্জা নিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ঋণ ছাড়া তাকে প্রবেশ করতে বলা মানে শুধু শুধু মারখাওয়ার জন্য ঠেলে দেওয়া। এই মৌলিক মানবাধিকার সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

যারা ঋণ পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

দরিদ্র মহিলাদের অবস্থান

আমরা কর্ম-সংস্থানের কথা যখনই বলি তখন আমরা বরাবরই পুরুষের কর্ম-সংস্থানের কথা বোঝায়। মেয়েদের সঙ্গে কর্ম-সংস্থানের কোন যোগাযোগ আছে এটা আমাদের মনেই আসে না। অনেক সময় এমন যুক্তিও শোনা যায় মহিলাদের কর্ম-সংস্থা হলে তাতে সামগ্রিকভাবে ক্ষতির কারণ হবে। কারণ এতে পুরুষদের কর্মসংস্থান কমে যাবে। যেন পুরুষদের কর্ম সংস্থানে ফায়দা এতবেশি যে তাকে ক্ষুণ্ণ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান করা মোটেই কাম্য হতে পারে না।

মহিলারাও যে শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত এটা আমরা ভুলে গেছি। এটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে।

আমাদের সমাজের প্রকৃত চেহারা দেখতে হলে মহিলাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখা দরকার। তাতে এই চেহারার বিকৃতিগুলি লুকিয়ে রাখার অবকাশ থাকে না। বিশেষ করে সে অভিজ্ঞতা যদি দরিদ্র মহিলার হয়। সমাজের নিগীড়নের যত কৌশল আছে সবকটি গরিব মহিলাদের উপর নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়। এতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের আশঙ্কা থাকে না। দারিদ্রের নিগীড়নের সঙ্গে পুরুষ-শাসিত সমাজ কর্তৃক দরিদ্র মহিলার প্রতি হৃদয়হীন আচরণের ভয়াবহ তম অংশ যখন সংযুক্ত হয় তখন তা সভ্য সমাজের রীতিনীতির গন্ডী ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যায়।

আমাদের দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ স্বামী নিগৃহিতা, পরিত্যক্তা, তালাক প্রাপ্ত নিয়ে গঠিত। এঁদের যে পৃথক কোন ব্যক্তিসত্তা আছে, নিজস্ব কোন সম্ভাবনা আছে, সেরকম ধারণা করার সুযোগ সৃষ্টি হতে দিতে সমাজ নারাজ। অথচ সাংসারিক এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করতে জানেন না, বা করেন না। সাংসারিক নানা কাজকর্মের যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেন সে দক্ষতা অনায়াসে অর্থোপার্জনের কাজে লাগানো যায়। অন্যের বাড়িতে ধান ভেনে সারা দিন একবেলা খানা এবং আধসের চাল পাওয়ার চাইতে নিজে ধান কিনে ভানতে পাড়লে কমপক্ষে দৈনিক বিশ টাকা নগদ লাভ। তার উপর খুদ-কুড়া। কিন্তু পুঁজির অভাবে তারপক্ষে এসবের কিছুই করার উপায় নাই।

দারিদ্র নিয়ে দুঃশ্চিন্তা কারও কম নাই। কিন্তু এই দারিদ্র যে -জন গোষ্ঠীকে কঠিনভাবে আঘাত করে, তাদের কথা পৃথকভাবে আলোচনায় আসে না। দারিদ্র যাদের কাছে সবচাইতে রূঢ়তম রূপ নিয়ে দেখা দেয় তাঁরা হলেন দরিদ্রা মহিলা। অভাবের দিনে স্বামীও নিখোঁজ হয়ে যায়। বাপ তার অভুক্ত সন্তানের মুখোমুখি না হবার জন্য পালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু মা পারেন না। মাকে অভুক্ত সন্তানের মুখে আহার জোগানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। একজন দরিদ্র মহিলাকে যেভাবে সারা জীবন ধরে অভাবের মোকাবিলা করতে হয়, অন্য কাউকে সেভাবে করতে হয় না। দারিদ্রা যেভাবে মহিলাকে অবমাননা করে, নিষ্পেষিত করে পুরুষকে সেভাবে করে না।

সেজন্য অভাব দূর করার সামান্যতম সুযোগ পাওয়া গেলে একজন দরিদ্র মহিলা যেভাবে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, একজন দরিদ্র পুরুষ সেরকমটি করেন না। দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা মহিলাদের মাধ্যমে সফল হবার সম্ভাবনা সেজন্যই বেশি। মহিলারা তাঁদের আয় থেকে সঞ্চয় করার চেষ্টা করেন অনেক বেশি। মহিলারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন পুরুষের চাইতে বেশি। তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান, সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান, সংসারের নিরাপত্তা চান। মহিলারা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম করতে রাজি থাকেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য, স্বামীর মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকেন।

অথচ দরিদ্র বিমোচনের সামগ্রিক চিন্তায় মহিলারা একেবারেই অনুপস্থিত। আমার মতে দরিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা মহিলাদের মাধ্যমেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

দারিদ্র ও কর্ম-সংস্থান

কর্ম-সংস্থান হলেই দারিদ্রের অবসান হবে এরকম একটা ধারণার বশবর্তির হয়ে আমরা দারিদ্রের কথা উঠলেই কর্ম-সংস্থানের খোঁজ করি। কর্ম-সংস্থান মাত্রই দারিদ্র্যের অবসান নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থান দারিদ্রকে চিরস্থায়ী করে দেবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। কর্ম-সংস্থান থেকে যদি একজন ব্যক্তি তাঁর মৌলিক চাহিদা মেটানোর পর উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত আহরণ করতে না পারে, তাহলে সে কর্ম-সংস্থান তাকে দারিদ্র্যের মধ্যেই টেনে রাখবে চিরকাল। কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে সারাজীবন বস্তিতে কাটানোর নাম দারিদ্রের অবসান নিশ্চয়ই নয়। অথচ এর নাম কর্ম-সংস্থান।

মজুরি ভিত্তিক কর্ম-সংস্থানের মধ্যে এদেশের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে দারিদ্রের

অবসান হবে না। কারণ, বেশিরভাগ মজুরি ভিত্তিক কর্মে যে মজুরি পাওয়া যায় তা নুন-আনতে পান্তা-ফুরায় জাতীয় মজুরি। এটা মজুরির সান্ত্বনা মাত্র। দ্বিতীয়ত যে বিপুল শ্রমশক্তি কর্ম-সংস্থানের অপেক্ষায় আছে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মজুরি ভিত্তিক কর্ম-সংস্থান পেতে পারেন। তৃতীয়ত মজুরি ভিত্তিক কর্ম-সংস্থানের মহিলাদের প্রবেশাধিকার নাই বললেই চলে।

আমাদের দেশের লোকের ঐতিহ্যগত পেশা (অর্থাৎ জীবিকার উপায়) হচ্ছে 'গৃহস্থী'। 'গৃহস্থী' শব্দের মোড়কে যে ছবিটি তুলে ধরা হচ্ছে সেটি হচ্ছে একজন ব্যক্তি তাঁর সন্তান সন্ততি নিয়ে নিজের আহার নিজে উৎপাদন করেন, বাড়তি উৎপাদন অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে সাংসারিক প্রয়োজন মেটান। এটা স্ব-কর্মসংস্থানের একটা ধ্রুপদী চিত্র। সাম্প্রতিক কালে জমি-জিরাত হারিয়ে গৃহস্থী শব্দটার পাশাপাশি আরেকটা শব্দের প্রচলন হয়েছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য। সেটি হচ্ছে 'টুকটাক' করা। 'কি করেন?' 'এই টুকটাক করি'। এটা ভূমিহীনের জীবন চিত্র। গৃহস্থীর ভিত্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। জমি-জিরাত নাই। গোলা নাই। গোয়াল নাই। আছে দু'খানা হাত। কাজেই তিনি তা দিয়ে টুকটাক করেন। যখন যা পারেন তাই করেন। এর থেকে আহার সংগ্রহ করতে হয়। বেঁচে থাকতে হয়।

এটা একটা হতাশার ছবি। এই হতাশার মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলো দেখি আমি। যিনি গৃহস্থী করেন তিনি জমির বাঁধনে আবদ্ধ, তাঁর জীবন ধারা ঋতু পরিবর্তনের মত অ-পরিবর্তনীয় চক্রে আবর্তিত, তাঁর চিন্তা গৃহস্থীর জীবন দর্শনের খুঁটিতে বাঁধা। যিনি টুকটাক করেন তিনি প্রতিনিয়ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি শিকারী। ঝোপ বুঝে কোপ। গৃহস্থ ধান কেটে বাড়ি নিয়ে গেলে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে ধান নাড়ার আশপাশ থেকে সযত্নে তুলে নেন। তিনি ইঁদুরের গর্তে হাত গলিয়ে দিয়ে ইঁদুরের থাবা থেকে সঞ্চিত ধানের গোছা টেনে বের করে আনেন। তাঁর চোখ সদা সচেতন। ভেতরে তাঁর কোন বাঁধন নেই। মূলতঃ তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে নারাজ নন। তিনি নতুন নতুন বুদ্ধি গ্রহণ করতে গর রাজি নন। তিনি পরিবর্তে আগ্রহী। মোটমাট, টুকটাকের মধ্যে একটা সম্ভাবনার রেখা আছে।

স্ব-কর্মসংস্থানকে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে স্থান দিলে এই ছোট ছোট সম্ভাবনাগুলি বাস্তবে রূপ নিয়ে বিরাট অর্থনৈতিক জোয়ারে পরিণত হতে পারে। স্ব-কর্মসংস্থান মহিলাকে গুরুত্ব দেয়। পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে না, পরিবারের সকলে একই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে, কেউ চাকুরি করে রোজগার করবে, অন্যরা বেতনের টাকা বসে বসে খাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। স্ব-কর্মসংস্থানের পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এটাকে অগ্রাধিকারের শীর্ষে যদি সত্যি সত্যি স্থাপন করা হয় তাহলে সমস্ত অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ভাবনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই হতে হবে.... কারণ স্ব-কর্মসংস্থান সরাসরি গরিবদের ব্যাপার... এখানে কোন 'মাধ্যমের' অবকাশ নেই। অথচ মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নামে বিত্তশালীরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ নির্দ্বিধায় নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসার সুযোগটি পেয়ে যায়।

মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে গেলে মাথাপিছু যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিনিয়োগের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। এতে যেমন মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে না, তেমনই অচল প্রযুক্তি বিক্রি করে একধোকে আচল সম্পদ

লোপাট করে নিয়ে যাওয়ারও উপায় থাকে না।

স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দরিদ্রের জন্য ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিনিয়োগ, তুমি কার?

বিনিয়োগের শ্রেণী বিন্যাসে তিন ধরণের বিনিয়োগ সাধারণত উল্লেখ করা হয়ঃ ১। রাষ্ট্রীয় খাত, ২। বেসরকারি খাত, ৩। বৈদেশিক খাত। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আমরা আলোচনার বাইরে রাখলাম। অন্য যে দুটি খাত আছে দেখতে তা দুরকম মনে হলেও আদতে এক। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ যেটা ব্যয় হয় সেটাও মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকেই আসে, রাষ্ট্রীয় অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে। কাজেই বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কার মাধ্যমে হবে কী কাজের জন্য হবে, সেটা সরকার বেঁধে দিতে পারে।

তাহলে সরকার বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের দায়িত্ব কার কাছে দেবেন? মনে করা যাক, সরকারের কাছে দুটি বিকল্প আছে। একটি হচ্ছে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ কয়েকজন বড় শিল্পপতির হাতে তুলে দেওয়া, যাতে করে তাঁরা বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে তুলে দেশে উৎপাদন বাড়াবেন এবং মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয় পন্থাটি হল সেই একই পরিমাণ অর্থ অসংখ্য দরিদ্রব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেওয়া যাতে করে তাঁরা তাঁদের চিন্তাভাবনা থেকে বুদ্ধি বের করে, টাকাটা খাটিয়ে নিজেদের আয়ও সম্পদ বাড়াতে পারে।

সরকার কার হাতে টাকাটা তুলে দেবেন?

আমার জবাব হবে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে এবং দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে স্বনির্ভরতার স্বার্থে টাকাটা অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেওয়াই মঙ্গলজনক হবে।

গুটি কতক শিল্পপতির হাতে এই সম্পদ তুলে দেওয়ার অর্থ হবে তাঁদের কে আরও সম্পদশালী করে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। অল্প কজন শিল্পপতির হাতে পরে এই সম্পদের কত অংশ সত্যিকার ভাবে বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার হবে, এবং কত অংশ বাইরে পাচার হয়ে যাবে এবং/কিংবা বিলাসী ভোগ্যপণ্যে ব্যয়িত হবে সেটা দেশের পরিস্থিতি থেকে আঁচ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে অংশ পাচার হল সেটা থেকে জাতি সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত হল। যে অংশ বিনিয়োগে লাগল সেটি যাবে বিদেশী প্রযুক্তি-নির্ভর প্রায় স্বয়ংক্রিয় এক শিল্প প্রক্রিয়ায়। এর আমদানিতে গেলে বৈদেশিক মুদ্রা, সেদেশের বিশেষজ্ঞদের আনাতে এবং পুষতে ব্যয় হল অজস্র। তারপর ভবিষ্যতের জন্য বাঁধা পড়ল দেশ, এই প্রযুক্তির আমদানির মাধ্যমে। খুচরো যন্ত্রাংশ লাগবে, বিশেষ ধরনের কাঁচা মাল লাগবে, যন্ত্রের রক্ষনাবেক্ষণে জন্য লাগবে বিদেশী বিশেষজ্ঞ। দেশ পরনির্ভরতার জন্য দশ আঙুলের টিপসই দিয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। এতেও শেষ নেই। সম্পদের যে ভাবটা বিলাসী ভোগ্যপণ্যে গেল সেটাও দেশের ভাগে থাকল না। বিত্তশালীদের যে বিলাসী ভোগ্যপণ্য সেটা আবার যেমন তেমন দেশ বানাতেও পারে না—আমাদের দেশে তৈরি হবে ঐ জিনিস এরকম ভাবও অপমান জনক। কাজেই সেভাগ্যটাও গেল। এই বিলাস দ্রব্যকে তরতাজা রাখার জন্য আনুষঙ্গিক যা কিছু লাগবে সেটাও এখন বছরের পর বছর বিদেশ থেকে আনতে হবে।

এরপর মনে করুন শিল্পপতির কারখানা চালিয়ে প্রচুর মুনাফা হয়েছে। সে মুনাফা কোথায়

যাবে? হয় বিনিয়োগে (যেটা হবে বিদেশ নির্ভর) কিংবা যাবে বিলাসী ভোগ্যপণ্যে (আবার বিদেশ)। মোট কথা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক মোটা করলাম অন্য দেশের।

অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে যদি বিনিয়োগের অর্থ পৌঁছনো যেত তাহলে পুরো চক্রটিই উল্টো দিকে, অর্থাৎ দেশের জন্য মঙ্গলজনক দিকে ঘুরত। গরিব মানুষ যে সব কাজে অর্থটা বিনিয়োগ করত সেটা হত মূলতঃ দেশি প্রযুক্তি নির্ভর, তারজন্য বিশেষজ্ঞ আমদানি করতে হয় না, তার কাঁচা মাল গ্রাম কিংবা গঞ্জের হাতেই পাওয়া যায়। এই বিনিয়োগ করতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজের গ্রামে কিংবা পাশের গ্রামের আর একজনের কাজের চাহিদা সৃষ্টি করলেন। বিনিয়োগের ফলে যে জিনিস তৈরি হল সেটি গ্রামের হাটেই বিক্রি হল। গরিবের আয়/মুনাফা হলে সেটা যে ভোগ্যপণ্যে ব্যয় হবে সেটা দেশেই প্রস্তুত হয় কিংবা প্রস্তুত করা যায়। একজনের উৎপন্ন দ্রব্য আরেকজন কিনবে। ফলে চাহিদার অভাবে মাল পড়ে থাকবে এমন টি হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। দেশ স্ব-নির্ভরতার পথে অগ্রসর হবে। দেশে আভ্যন্তরীণভাবেই অর্থনৈতিক কর্ম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। গরীবের জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি হবে।

আমি বরাবরই আবেদন করে এসেছি অসংখ্য মানুষকে ফেলে রেখে গুটি কয়েক মানুষকে নিয়ে যদি অর্থনীতি সামনে চলতে যায় তাহলে অর্থনীতির চাকা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এমন একদিকে ঘুরতে আরম্ভ করবে। অর্থনীতির চাকা একবার উল্টোদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে এটাকে সোজা দিকে ঘোরানো বড় কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এখনও সুযোগ আছে এই চাকাকে দৃঢ় হাতে সোজা দিকে মুচড়ে দেওয়ার।

ভূমিহীনদের যৌথ উদ্যোগ

১৯৮১ সালে প্রথম যৌথ উদ্যোগের দিকে আমরা পা বাড়াই। প্রথম কাজটি ছিল একটি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অগভীর নলকূপ ক্রয় করার জন্য যৌথভাবে ঋণ গ্রহণ। সাফল্যজনক ভাবে তারা ঋণটি একবছরের মধ্যে শোধও করে দিয়েছিলেন। এরপরেই যৌথ উদ্যোগ আসল মহিলাদের ধানকল স্থাপন। বলতে এখন খুব সহজ মনে হলেও প্রত্যেকটির পেছনে প্রচুর উদ্যোগ-আয়োজন প্রয়োজন হয়েছিল। অগভীর নলকূপের বেলায় বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক প্রশ্ন করে বসল ভূমিহীনরা অগভীর নলকূপ দিয়ে কী করবে? নলকূপ স্থাপনের জমি কোথায় পাবে? টাকা শোধ করবে কিভাবে? এটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের কাছে এতরকমের জবাবদিহি করতে হয়েছিল মনে হয়েছিল যেন আমরা অসামাজিক কোন কাজে লিপ্ত হতে যাচ্ছি- এবং তাঁদের হাতে ধরা পড়ে গেছি। দীর্ঘ একবছর এই লেখালেখি এবং বৈঠকের পড়ে অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের ব্যক্তিগত সমর্থনের মাধ্যমে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কর্মকর্তাদের নিকট। পরবর্তীতে যখন আমরা গভীর নলকূপ যৌথ উদ্যোগে কোনার জন্য অগ্রসর হলাম, তখন বি, এ, ডি, সি, বৈকে বসলেন। তাঁরা জানালেন যে সরকারের আইন অনুসারে ভূমিহীনদের নিকট গভীর নলকূপ বিক্রি করা যায় না। গভীর নলকূপ কিনতে হলে জমির মালিক হতে হবে। প্রথম প্রথম মনে করলাম এটা একটা মন গড়া করা। সরকারের আইনেই এটা থাকতেই পারে না। কাগজপত্র বের করে দেখলাম-কথাটি তাই আছে। অনেক দরবার করতে হল এই আইন

বদলাতে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসাহেবকে ধরলাম। তিনি নিয়মটি পরিবর্তন করতে সম্মত হলেন। আমাদের বক্তব্যের যুক্তি অনুধাবন করলেন। মন্ত্রিসাহেব লিখিত নির্দেশ দিলেন নিয়ম পরিবর্তনের জন্য। নির্দেশটি সরকারি যন্ত্রের নানাস্তর পার হয়ে হুকুম হয়ে বের করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হয়েছে আমাদের। নিয়মটি পাল্টে এখন করা হল এরকম ঃ যদি কোন গভীর নলকূপ বিক্রি করা হয়, এবং এই গভীর নলকূপটি কেনার জন্য কোন ভূমিহীন ব্যক্তি এককভাবে বা ভূমিহীন গণ যৌথভাবে কেনার জন্য আগ্রহী হন তবে নলকূপটি ভূমিহীনদের নিকট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিক্রি করতে হবে।

ক্রমে ক্রমে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র বেড়েছে। ঋণের পরিমাণও বেড়েছে। এক কেন্দ্রে যৌথ উদ্যোগ থেকে এক শাখার সকল সদস্যের যৌথ উদ্যোগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। পুকুর লীজ, জমি লীজ, হাটবাজার ইজারা, জলমহাল ইজারা, পাওয়ার টিলার, থ্রেশার, তেলের মিল, তাঁতের মিল, ধানকল, অগভীর ও গভীর নলকূপ ইত্যাদি নানা কাজে যৌথ উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ৮৫-তে যৌথ উদ্যোগের মাঝে মাঝে ফাটল দেখা গেল। যৌথ উদ্যোগ চালাতে গিয়ে কেন্দ্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে অনেক জায়গায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দু-একজনের হাতে টাকা পয়সার নিয়ন্ত্রণ চলে গেল। বড় বড় যৌথ উদ্যোগ চালাতে গিয়ে স্থানীয় কোন্দলের মধ্যে কেন্দ্র ঢুকে পড়ল। যৌথ উদ্যোগের উৎসাহে ভাটা নেমে আসল।

৮৬তে আবার নতুন ধরনের যৌথ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ৮৫-র জোনাল ম্যানেজার সম্মেলনে স্থির হল এখন থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রযুক্তি বিভাগ প্রথমে সরাসরি যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে। উদ্যোগটি ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠলে ক্রমে ক্রমে তার মালিকানা এক বা একাধিক কেন্দ্রের হাতে ছাড়া হবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এক-চতুর্থাংশ মালিকানা নিজের কাছে রাখবে এবং কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজে রাখবে। তবে যখন স্থানীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে তখন অধিকতর দায়িত্ব স্থানীয় ব্যবস্থাপনার কাছে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এই নীতিতে প্রযুক্তি বিভাগ ক্রমে ক্রমে অচল যৌথ উদ্যোগগুলির দায়িত্ব নিজে নেওয়া শুরু করল। সেগুলি নতুনভাবে গড়ে তুলে ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল করে তোলার জন্য সচেষ্ট হল। এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে এ নীতিতে যৌথ উদ্যোগ সফল হবার সম্ভাবনা আগের চাইতে অনেক বেশি হবে।

৮৬-তে এ নীতি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অভাবনীয় রূপে। মৎস্য মন্ত্রণালয় আমাদেরকে অনুরোধ করলেন নিমগাছি মৎস্য খামার নামক বিরাট আকার এক খামারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। এই খামারে পাঁচ হাজার বিঘা জলায়তনের মোট সাত শত ত্রিশিটি পুকুর আছে, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চারটি উপজেলায়। কোন কোন পুকুরের আয়তন ৫০ একরের উপরে। সরকার গত ১০ বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করেছে পুকুরগুলি সংস্কার করে মাছ চাষের জন্য। গাড়ি বাড়ি অনেক হয়েছে, কিন্তু পুকুর থেকে মাছ আসেনি।

মৎস্য মন্ত্রণালয় অবশেষে এর কোন গতি হবে না মনে করে সমগ্র খামারটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। আমরা প্রথমে রাজী হই নি যেহেতু মাছ চাষের

ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। পরে আমরা সম্মত হই এশর্তে যে এটা ২৫ বছরের জন্য আমাদেরকে লীজ দেয়া হবে। এ মেয়াদকালে মৎস্য মন্ত্রণালয় আমাদের উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করবেন না। আমরা সফল হলে আনন্দের বিষয় কিন্তু যদি বিফল হই তার জন্যে আমাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

৮৬-র জানুয়ারীতে চুক্তি সই হলো। কিন্তু খামারের দায়িত্বভার পেতে পেতে জুন মাস পর্যন্ত সময় লাগলো। আমরা এর নাম পাল্টে নতুন নাম রাখলাম জয়সাগর মৎস্য খামার। এ-এক বিরাট সুপ্ত সম্পদ। মনে হলো এই পুকুরগুলোকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে বছরে তিন চার কোটি টাকার মাছ এখান থেকে উৎপন্ন করা যায়। পুকুরের দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল কাগজ পত্রে এগুলি সরকারের পুকুর হিসেবে আমাদের হস্তান্তর করা হলেও এর অর্ধেকেরও বেশি পুকুর স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দাবি করে ভোগ দখল করে যাচ্ছে। আমাদের দাবি তাঁরা গ্রাহ্য করতেই নারাজ। যে কটা পুকুরে আমরা আমাদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম সেখান থেকে ৮৬ সালে মাছ ধরলাম। ১০ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হল।

পোনা উৎপাদন কেন্দ্রটি অবহেলায় পড়েছিল। সেটিকে আমাদের কর্মীরা সচল করল। তারা প্রতিজ্ঞা করল এই পোনা উৎপাদন কেন্দ্রে তারা অন্তত একশত কেজি (চার কোটি) পোনা উৎপাদন করবে। তারা আগে কোন দিন পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখে নাই পর্যন্ত। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হতে এসে এখন হয়ে পড়েছে পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের কারিগর। তাদের ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের জয় হয়েছে। ৮৬ সালে পুরো বাংলাদেশের সকল হেচারির মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ পোনা উৎপাদন গৌরব তারা অর্জন করেছে প্রথম প্রচেস্টাতেই। তারা ১৬৫ কেজি পোনা (৬ কোটি ৬০ লক্ষ পোনা) উৎপাদন করেছে।

অক্টোবরের বন্যায় অনেক পুকুর যেগুলিতে মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল ভেসেগেল। যত উৎপাদন আশা করা হয়েছিল তত উৎপাদন করার আর সুযোগ রইল না। এখন খামারের কর্মীরা আশা করছে ৮৭ সালের মাছ ধরার মৌসুমে ৩০ লক্ষ টাকার মাছ ধরা যাবে। মার্চ মাস থেকে মৌসুম শুরু হবে।

জয়সাগর মৎস্য খামার একটি বিরাট আয়তনের যৌথ উদ্যোগ। এটার অংশীদার হবেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সকল সদস্য-সদস্যা। ক্রমে এই খামারের মালিকানা দেবার জন্য তাঁদের কাছে খামারের শেয়ার বিক্রি করা হবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এক চতুর্থাংশ মালিকানা নিজের কাছে রাখবে এবং এই খামারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজে পালন করবে।

এই নীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যে কোন আয়তনের যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। এর মুনাফা বাবদ বাৎসরিক যে লভ্যাংশ পাবেন সেটা সরাসরিভাবে একেকজনকে ব্যক্তিগতভাবে না দিয়ে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একটা 'মুনাফা তহবিল' গঠন করা যায় এবং সে তহবিলে এটাকা জমা করা যায়। এই তহবিলের টাকা দিয়ে তাঁরা স্থানীয়ভাবে নতুন যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানারকম কর্মসূচি নিতে পারেন, যেমন ঃ গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি, যৌথভাবে জমি ক্রয়, আকাল নিরোধক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি ইত্যাদি।

এরকম আরও একটি যৌথ উদ্যোগ মৎস্য মন্ত্রনালয়ের সৌজন্যে আমরা শুরু করেছি। সেটি

হল চকরিয়া চিংড়ি খামার। মৎস্য মন্ত্রণালয় থেকে তিন শত একর জমি ১০ বছরের জন্য লিজ নিয়ে এই খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮৬ সালের চিংড়ি চাষ মৌসুমে এই খামারে ২৩ লক্ষ টাকার চিংড়ি মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

এই খামারটির মালিকানা চকরিয়া উপজেলার ১৫ হাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে সীমিত রাখা হবে। যদি সরকার থেকে আরও চিংড়ি চাষের জমি পাওয়া যায় তবে মালিকানার আওতা আরও সম্প্রসারণ করা যাবে।

যৌথ উদ্যোগের এই নতুন নীতিতে যেমন প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার বড় বাধাগুলি অতিক্রম করা যাবে তেমনই বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের একটি পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে দেশের অব্যবহৃত সম্পদও যদি এধরণের যৌথ উদ্যোগের আওতায় আনা যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। দেশের অব্যবহৃত খাস পুকুর, হাওড়-বাওড়, জলমহাল, হাজার হাজার একর চিংড়ি চাষোপযোগী জমি, বনাঞ্চল, উদমপাহাড়, খাস জমি, বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল সব কিছুতেই প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। উপযুক্ত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিলে এর মাধ্যমে বহু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যেতে পারবে।

ভূমিহীনদের নিকট নানারকম সম্পদ বন্টন করে দেবার সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে সরকার নিয়ে থাকে। কোন কোন সময় জমি, খাস পুকুর, চরাভূমি, মাছের জমি ভূমিহীনদের নিকট বন্টনও হয়ে থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে ভূমিহীনদের নিকট সরকার যাই দিক না কেন, সেটা তার কাছে সত্যি সত্যি পৌঁছনোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদি সত্যি সত্যি কেউ পৌঁছতে পারে, তবে সেটা তার হাতে বেশিক্ষণ ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা করা কখনও সম্ভব হবে না, সেটা খাস পুকুরই হোক, বা সামান্য কম্বলই হোক।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পদ্ধতিতে যদি সংগঠিত ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পদের সমষ্টিগত মালিকানায় আনা যায় তাতে তার মালিকানা যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনই তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি সোচ্চার করাও সহজ হবে।

এটা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সব ক্ষেত্রেই সম্ভব।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট (বি, আই, বি, এম) এ ২৭, জানুয়ারী ১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এক দশক' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তৃতা।

সৌজন্য ঃ সুবর্ণ বাংলাদেশ

কবিতা

অনুবাদ কবিতা

নব্বই দশকের শিশুকন্যা

সুগতাকুমারী (মালয়ালম)

অন্ধকারে পবিত্র উঠোনে
ফেলে চলে যাব এই দুধের বাছাকে
অযাচিত জন্ম তার
তোমার হাতেই সঁপে দিলাম, পৃথিবী!

মেয়ে হয়ে জন্মেছে তবু পারিনি তো
গলাটিপে মৃত্যু এনে দিতে
ক্ষমা কোরো অভাগিনী মাকে-
তোমার প্রশস্ত কোলে ঠাঁই দিও - যতটুকু পারো।

মায়ের চোখের জলে ধুয়েছি বাছাকে
শেষ বারটির মত স্তন্য দিলাম
কপালের মাঝখানে এঁকে দিই চুমো
মায়ের হৃদয় ছেঁড়া অক্ষয় তিলক।

তারপর চলে যাব বিবর্ন বিবরে
এই অভাগিনী শিশু কন্যাটিকে ফেলে
হে জননী বসুমাত্র দুর্ভাগা সীতাকে তুমি দেখো!

ওর জীবনে কি ভোর হবে?
আসবে কি দিন?
নাকি এই রাতেই সে ছিন্ন ভিন্ন হবে
নিষ্ঠুর ধারালো কোন দাঁতে?

ভাবী কাল, ওহে ভাবীকাল
আসবে কি একটিও আগামী সকাল?
মেয়ে এ যে, জন্মেই আগাছা
তার জন্য জীবন? অদ্ভুত উচ্চাশা!

সে কি জানবে কোন দিন
ভালবাসা কাকে বলে লোকে?
অনাথ আশ্রমে সে কি ঠাঁই পাবে কোন

মানুষের সন্তান হিসেবে?
কি নিয়তি তার?
ভেসে গিয়ে ভিন দেশে
বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে
ভারতীয় গিনিপিগ হবে?

আর যদি ভাগ্য ভাল থাকে
গৃহলক্ষ্মী হতে পারে সেও
যদি সে কখনো পায়
রূপকথার রাজার কুমারের প্রণয়।

কে জমাবে তার জন্য লক্ষটাকা পণ?
সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে
যাতে হয় গরবিনী বধূ?
নাকি জ্যান্ত পুড়তে হবে

যথেষ্ট সোনা দানা না আনার
ঘৃণ্য অপরাধে?
অথবা সে শূণ্য হাতে
ফিরে আসবে 'তিন তালাক শুনে'!

উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটনি খেটে যাবে
পেটে কিল মেরে শেষে মৃত্যু তুলে নিতে?
অথবা মাতাল হাতে নির্বোধ চাবুকে
কালশিটে নীল দাগে নিরীহ শিকার?
বাজারে নীলামে তোলা হবে
কিম্বা রক্তচোষাদের থিক থিক জটলায়
ছুঁড়ে দেবে অন্ধকার গলি?

শহরের নর্দমায় ছিবড়ে হয়ে অভাগী বালিকা
গড়াগড়ি যাবে কোন ভাঙা হাসপাতালে বারান্দায়?

সানকি হাতে দোরে দোরে ফিরবে সেই মেয়ে
খিদের আগুনে জ্বলে পুড়ে?
প্রভুর দুঃখের প্রতিনিধি হবে সে?

হে দেবী বসুধা
তোমার বাজারে নারী সস্তা সব চেয়ে

ফালতু একেবারে - যাকে ফেলে দেওয়া যায়।
তবু ওরে বুক ছেঁড়া মানিক আমার,
হেসে কেঁদে তাকিয়ে আছিস
আমার চোখের দিকে কেন?

আমি ও তো মেয়ে হয়ে জন্মেছি এখানে
বেঁচে আছি কেননা আমার ভীরু মা
সাহস পায়নি শ্বাস রোধ করে মারতে আমাকে।
সত্য সবই তবু স্বপ্ন দেখি
একদিন ফুটে উঠবে আলো
কোন এক জনক রাজার কোলে দুলবে এই সীতা।
মমতার দু হাতে সে বড় হবে এক
প্রস্ফুটিত পবিত্র শিখায়।
সে শিখা হবে না দগ্ধ, যাবে না কোথাও বনবাসে।

সে বাঁচবে বাঁচার মতন
দু - হাতে বাঁচাবে আরো প্রাণ
জীবনের সোনার নিশান
তার হাতে আকাশে উড়াল।
মাথা নোয়াবেনা সে তো, নোয়াতে দেবে না কাউকেই।

দাঁড়িয়ে নিজের পায়ে তার স্মিত মুখ
ভেসে যাবে মাতৃ মমতায়।

মহাশক্তি শিশু হয়ে তার পায়ে পায়ে
ঘুরবে আর জননী পৃথিবী
তারই কোলে স্বান্ত্বনা কুড়াবে।

স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন ছিল বুকে
এ মেয়েরও স্বপ্ন প্রাপ্য আছে
যদি ও সে পরিত্যক্ত অনাথা বালিকা
নীলমের পাটে ওঠা মানুষের হাটে।

রাত গলে যাচ্ছে ধীরে সময়ের হাতে
আর দেরী নয়
চুমো দিই তোর ছোট্ট কপালের মাঝে
শেষবার শেষ চুমোটুকু .....
পালাও পালাও আর ফিরে এসনা-

গুমরে ওঠা কান্না নয়, নয় কোন কথা
শুকনো চোখ কানে গোঁজো তুলো।
অশ্রুর বাষ্পকে টেনে ভিতরে ফেরাও
যাতে এক বিন্দু মায়া ভেজাতে না পারে ওই বুক।
শুষে নাও সব।

বিক্ষত বুকের থেকে রক্ত পাত নয়
কোন দাগ রেখে যাওয়া নয়।
ফেরার রাস্তাই নেই আর
পালাও যতটা জোরে পারো--
পালাও পালাও।

তুই কি জানিস?
বি. টি. ললিতা নায়ক (কন্নড়)

ওরে খাঁচার টিয়ে
অরণ্যানী এবং আকাশ কোথায় আছে জানিস?
জানিস কি তুই পূবের আলো
সমুদ্র পশ্চিমে
উড়াল পাখির ডানা?
ছন্দে গানে নৃত্যে মাতে তাজা বাতাস
নতুন দিগন্তনে?
গভীরতম খাদ অথবা
সবচে উঁচু চূড়া
চাঁদের জগৎ তারও চেয়ে দূরে?

আম জাম আর শকুনগুলো
বনবিড়ালের লোভ
চিনেছিস কি নিজের পাখায় পাখায়?

লজ্জা

ই, পার্বতী (তেলুগু)

এ একটা জীবন হলো?
জানোয়ার ও এর চেয়ে ভাল।
গুঁড়ি মেরে উঠে যাচ্ছে শুঁও পোকা দেয়ালের গায়ে

ওকে বলি, কিছুদিন নাও এ জীবন।
ও বলল, অসম্ভব, ফালতু বোঝা আর
নিতে পারবনা এই পিঠে।
গাধাকে শুধোই মাঝপথে।
সে বলল, তাত ধৈর্য নেই
যে অমন বোঝা নিতে পারি।

কুকুর আমার প্রশ্নে বলে উঠল - ওহে
যদি ও কুকুর আমি তবু এর চেয়ে বেশী
বিশ্বস্ত হবার কোন ক্ষমতাই নেই---
ওরা ভাঙে ভালবেসে জীবনের রেখা
ভালবাসা! বাজারে পসরা!
ওই অকৃতজ্ঞদের সাথে কিছুতেই
মিলে মিশে থাকা অসম্ভব!

স্মৃতির গোরস্থান
সংস্কৃতি রানী দেশাই (গুজরাতি)

মস্ত এক গোরস্থান আমার ভিতরে শুয়ে আছে
প্রতিদিন বহু কিছু আমি গোর দিই।
কোনদিন একাকী নিশীথে,
যখন নিঃশব্দ গোরস্থান। কেউ নেই-
একটি কবর খুলে যায়,
আমি দেখি মৃদু জ্যোৎস্নায়।
কি যেন বেড়িয়ে আসে কি যেন সে করে.....
আমি দেখি অপলক একাগ্র নজরে।
তারপর ফিরে যায় কবরের বুকে
আমি চেয়ে বসে থাকি
এরপর কী ঘটে তা দেখি!

দিন আসে, আমি নিরুপায়
নতুন কবর খুঁড়ে গোর দিই নতুন কাহিনী।
প্রতিরাতে বসে থাকি
আমার স্মৃতির গোরস্থানে।
অনুবাদ ঃ শতরূপা সান্যাল

দুটি কবিতা

শুভঙ্কর ঘোষ

এক সমুদ্র আকাশ নিয়ে

বাসনা! বাসনা! পিং পং বলের মতো লাফ দিতে দিতে হাঁক দিয়ে গেল কোজাগরী রাত
কার বাসনা, কে সে বাসনা, ভাবতে ভাবতে একসমুদ্র আকাশ নিয়ে একলা বসে আছি
বাসনার শিকড় অবধি ছুটে যেতে চাই
বাসনার ডালপালা কতদূর বিস্তৃত, জরীপের জন্য যেতে চাই
রোমন্থিত প্রহরে প্রহরে ডুব দিতে চাই
কিন্তু তলা পাইনা, চরাচর নিঝুম হয়ে আছে
আর আমি
কার বাসনা কে সে বাসনা ভাবতে ভাবতে একসমুদ্র আকাশ নিয়ে
একলা বসে আছি।

আগুনের প্রেম

আমাকে কষ্ট দিয়ে খুব সুখ পাও
নিজেকে ক্লিষ্ট করে খুব সুখ পাই
জানি আগুনে সংশ্লিষ্ট হলে
পুড়ে হবো ছাই
তোমার আগুনে আমি নিভৃত কাঙাল
শূন্যে উড়ি বেপরোয়া মুগ্ধ হরিয়াল
ও আগুন জ্বলে ওঠো এই লগ্নে ধীরে ধীরে
শুরু হোক তোমার দহন
প্রস্তুত হয়ে আছে মন, যেতে চায় আগুনের
অত্যন্ত ভিতরে —
তুমি প্রণয়ের মেঘপুঞ্জ অগ্নিবর্না যাও ভেসে যাও
আমাকে কষ্ট দিয়ে খুব সুখ পাও
নিজেকে ক্লিষ্ট করে খুব সুখ পাই।

দুটি কবিতা

বিপুল চক্রবর্ত্তী

বন বাদাড়ের গান

কাকমারাদের ছেলে আমি
মাছমারাদের ছেলে
বনবাদাড়ে ঘুরি ফিরি
ফিরি খালে বিলে

তুমি আসবে কি
ভালবাসবে কি

আঁকশি দিয়ে আকাশ ধরি
শাল শিরীষের ডালে
সূয্যি এনে রাখি আমার
চালকুমড়োর চালে

তুমি আসবে কি
ভালোবাসবে কি

কংসাবতীর কাঁখের কাছে
ডুংরিজোড়ের খালে
তোমার জন্য জোৎস্না ধরি
রাত্রিমোড়া জালে

তুমি আসবে কি
ভালোবাসবে কি

বাবলাকাঁটা বাবলাকাঁটা
বাবলাকাঁটা হাতে
কৃষ্ণচূড়া ছড়িয়ে দিলাম
তোমার আসার পথে

আমাদের ভাষা

১.
গেঁড়ি গুগলি শামুকের সাথে সংসারে
শালুকের মতো

নক্ষত্রের দিকে চেয়ে যে ভাষা জেগেছে

চড়ুই শালিখ ঘুঘু ফড়িঙের পায়ে পায়ে
ঘাসফুলের মতো
যে ভাষা দুলেছে রৌদ্রে হাওয়ায় হাওয়ায়

যখন দাঁড়াই, আজো
বেনো মাঠে কোনো জলাশয়ের কিনারে
কাশফুল হেসে ওঠে শালুকেরা ঘোমটা তুলে চায়

২.
মাদলে মাদলে জাগে আমাদের ভাষা
সন্ধ্যাতারার নিচে
একতারা বেজে ওঠে আমাদেরই তড়িত ভাষায়

দুটি কবিতা

তিস্তা মিত্র

প্রণয় -- ১

পুরাবিদ্ খুঁড়ছেন নষ্ট প্রত্নকথা
এ দেহ জাগে না আর কামে
শুধু এক ভালবাসা (যাতনা - বিলাসী)
জেগে আছে শরীর শ্মশানে
তবু তোমার জন্যে দ্যাখো ফেরারী-আকাশ
পোড়ে নদী, হৃদি ভাসে বিয়োগান্ত-জলে

প্রণয় - ২

সরিয়ে রেখেছি মোহন-বটের ছায়া
সোহাগ পাখিরা ম'রে গ্যাছে পারঘাটে
তার চোখে দ্যাখা অখিলবন্ধু-মায়া
রাগ হয়ে ওড়ে বিপন্ন-তল্লাটে
প্রত্যাশাহীন হেঁটে যেতে হবে জানি
উপশমহীন শ্বাসকষ্টের রাতে
পুড়িয়ে দিলাম ভগ্ন-স্মৃতির কায়া
বেদার জ্বালছি হিংস্র বারনাবতে।

দুটি কবিতা

বিমল দেব

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ঃ এলিজি

'মুক্তকরো বন্ধনের দ্বার' বলেই তুমি
বিষ্ণুদের বাড়ী চলে গেলে, সেই শীতের সকালে
আকাশে ছিল তোমার নিমন্ত্রণ, বাতাসে ছিল
শুদ্ধকল্যাণের মূর্চ্ছনা -- অবাক বনানীর হাতছানি;
তোমার বুকের মধ্যে বেজে উঠছিলো সন্ধিপূজোর বাজনা
কলকাতার ট্রাম মধ্যরাতে কোথাও চলে যাচ্ছিলো
আমরা ক্ষুৎকাতর কিশোরের দল কি যেন জানতে
চেয়েছিলাম তোমার কাছে—
বটুকদা, আজও তোমাকে মনে পড়লে
আবার নতুন ক'রে বাঁচতে ইচ্ছে করে।

প্রকাশ কর্মকারের ছবি

বিচ্ছু একটা ব্যাপার হবে, মনে হচ্ছে---
ব্যাপারের মধ্যে একটা ব্যাপার
প্রচন্ড ঝাঁকুনী দিয়ে দুপুর নামছে
লাগসই উত্তরের আশায় বসে আছে
অপরাহ্ণ—
অভিমান নয়, একটা বিপুল ক্রোধ
আমাদের স্যাটেলাইটগুলো দখল করবে
ডাটা প্রসেসিং আর প্রোগ্রামিং জুড়ে
জেগে উঠবে আরো ভিয়েতনাম।

এমন

দিলীপ সামন্ত

এমন কোনও নারী নেই
যার কাছে বাদশা - বেগম, হারেম উড়ে যায় ঝড়ে
আর পাঁজিপুঁথি খুলে বসি
এমন কোন স্বদেশ নেই
যার জন্য পরিপাটী কাঁথা বুনে রোদ্দুরে শুকাই
এমন কোনও নদী নেই
যার বক্ষ জুড়ে পলিমাটি,বৃক্ষবীজ বনসাই
এমন কোন বাতাস নেই
যে যেমন খুশি যখন ইচ্ছে ঘুম আনতে পারে
এমনকি ভালোবাসাবাসি

এক গুচ্ছ কবিতা

অনুপ ঘোষাল

১. করতলে হাতরাখে
উদাসী বাতাস।
মৌসুমী ফুলে প্রথম অভিসার,
বিষন্ন জানালা দিয়ে মধুমাস এসেছে বোধহয়।

২. বুকচিতানো উঠোনে
এলোমেলো পদধ্বনি,
স্বপ্ননীল হলদি নদীর পার,
আর
দিনযাপনের অন্তহীন গ্লানি।

৩. স্বর্ণলতা অশ্রুর উৎস খোঁজে,
ধূধূল লতা খোঁজে
অতলান্ত বিষাদ,
শুধু -
নীলকণ্ঠ দিয়ে গেছে সশব্দ চুম্বন।।

৪. ওভাবে তাকিওনা আর
আমার প্রত্নবেদনা,
মহাকালের সৌরচিতায় জ্বলে উঠতে পারে
মহাবিস্ফোরনের দিনে।।

৫. আর কাছে এসোনা আমার
রুক্ষ বালুকায় কিশোরী ঝরনার মরন হয়
উত্তাপ শান্ত হয়না কখনো,
চাতকের মত চেয়ে থাকে
মরণ নামবে কবে?

৬. সিগারেট পুড়ে ছাই হয় শুধু,
শরীরও তো তাই।
তবু যদি একবার শোনাও অসমাপ্ত গান,
বাউলের ভিটে থেকে এনেদেবো
ববডিলানের সুর।।

৭. হৃদয়ের অলক্ষ্যে মেঘ
হলদ বিকেলে সড়ে পরতে চায়।
চিলের ডানায় ভর করে আসে প্রেম
তবু -

অচেনা ভয় হৃদপিন্ড চাটে।।

৮. অন্ধকারও উপভোগ্য আজ
বাঞ্জনার মানচিত্র জায়গা করে হৃদয় ইজেলে।
আমার উল্লাসকে যদি বলো ভ্রান্ত অক্ষরমালা-
জোনাকি মরণ হবে তাতে।।

৯. তোমার থেকে তিন ক্রোশ দূরে বসে,
কাঁঠালের লালপাতা সেরে পরে সেখানে।
একবার দিতে পারো-
সুনন্দ দিনরাত্রি।।

১০. তন্দ্রায় এসেছিল সে,
শ্মশান যাত্রীর মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে,
গোলাপ এনেছিলো সেদিন,
কারণ সে জানে-
গোলাপ আমার না পসন্দ।

১১. হৃদয় লক্ষ্য করে যতবার গুলি করেছে ওরা
ব্যর্থ হয়েছে সব।
আমি হৃদয়ে রক্ত রাখি না।।

এক গুচ্ছ কবিতা

নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১. কোন কোন আলো
চোখে ঠলি।
কোন কোন বৃক্ষ শাখা নত,
আকাশ মেঘের ভারে ঢাকা,
কোন কোন হৃদয় লুণ্ঠিত।

২. কিছু ক্ষুণ্ণ মানুষেরা,
কিছু দুঃখী মানুষেরা
কবিতায় আজও বেঁচে থাকে।

৩. ঠিক ঠাক নিজেকে সাজিয়ে
ঠায় বসে আছে।
চোখের জমিতে জল
এবড়ো খেবড়ো চন্দনের রেখা।
সুখের সমুদ্র থেকে দূর ব্যবধান এই
বিধ্বস্ত সংসারে।
ছিন্নমূল গার্হস্থ্যের উজ্জ্বল পতাকা

তবু ওড়ে।

৪. জানলার গ্রিলের ফাঁকে
নিঃসঙ্গ বালিকা চেয়ে থাকে।
চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।
অন্ধকারে প্রিয় মুখ মনে পড়ে যায়।

৫. তখন শৈশব ছিল,
নীল প্রজাপতি ডানা
খুশীয়াল রোমাঞ্চিত দিন।
আমার শরীর রোজ বুড়ো হয়
রণে ও সংঘাতে।

৬. অপরূপ বর্ণছটা
হিরন্ময় অনন্য আকাশে,
কত মেঘ ফুল হয়ে ভাসে।
প্রতিদিন আঁকে পথ, প্রতিদিন
চিহ্ন মুছে যায়।
ভাঙ্গা গড়া নৈঃশব্দ বিলাসী
কেউ কম, কেউ পেলো
বেশী।
এই নিয়ে বিবাদে বিষাদে
স্বেচ্ছাচারী দিন উড়ে আসে,
মধ্যযামে খন্ড অবকাশে।

৭. সকল উপেক্ষা আজ জ্বলে ওঠে
দাবানল হয়ে।
পাথরও উঠেছে কেঁপে
ছিটকে যায় অগ্নি শিখাগুলো।
অন্ধকার পথ ভেঙে ছুটে আসে
ক্ষিপ্র অশ্বারোহী
শানিত গভীর চোখ
জ্বলে ওঠে দীপ্ত প্রতিরোধে।

৮. ভালবাসা স্পর্শ রেখে যাও।
ভালবাসা বিলি কাটো চুলে।
ভালবাসা মানুষের চোখে
নিমেষে শূন্যতা ঘেরা আকাশের
নীলে।

দুটি কবিতা

শতরূপা সান্যাল

ও নদী

আমাকে রেখোনা দরজার পাশে
উড়ু উড়ু মন বারমুখো বড়
সারা মন শোনে আকাশের ডাক
বড় জানালাটা বন্ধ করো।

এক পা ভিতরে এক পা বাইরে
এভাবে রয়েছি অনেক সময়,
এবার আমাকে ঘরে ডেকে নিও
দোলাচলে দোলখেলা আর নয়।

আমি তো নিজেই চাইছি এখন
কৃষক নদীর বুকে বিশ্রাম
বাইতে চাইনা বইতে চাইনা
কোন মালিকের একটিও নাম।

ও নদী, তুমি কি শুনতে পাওনা
ডাকছে তোমায় কোন এক জনা?

ও আকাশ

হাত ছেড়ে দিলে
যখন খুঁজছি পাড়
যদিও জানতে
জানিনা আমি সাঁতার।

আজ ভেসে যাই
পড়ন্ত অবেলায়
আকাশের ছবি
নামছে আমার গায়।

ও আকাশ তুমি
আমায় নেবে কি বুকে
তীব্র সোহাগে
জীবনের অভিমুখে?

ঘরকন্নায়
তোমারও কি টিকি বাঁধা
লুকিয়ে ফেলেছো
সেই কবিতার খাতা।

এত সুখ সইবে না

ইমানুল হক্

আমার বউ বলল, পৃথিবী ঠিক ধ্বংস হয়ে যাবে।

সে তো একদিন যাবেই। বিরক্ত আমি, বলি।

- একদিন নয়, শিগগিরই যাবে।

- কী করে বুঝলে?

- দেখছো না, আমাদের ঘরে রোদ ঢুকেছে।

সত্যি, তাকিয়ে দেখি, অবাক ব্যাপার। কোনদিন একফোঁটা রোদ ঢোকে নি। হাপিত্যেশ করে বসে থেকেছি। ছুটির দিনে শীতকালে সামনের রাস্তায় গিয়ে ঠিক বেলা তিনটে থেকে তিনটে পনের পর্যন্ত দাঁড়ালে রোদের ছোঁয়া লাগে। গ্রীষ্মকালে বারান্দা পার হলে রোদের দেখা মেলে। কিন্তু কোনদিন ঘরের ভিতরে রোদ আসে নি। পড়তে বা কোন কাজ করতে হলে, টিউবলাইট জ্বেলে রাখতেই হয়। হল কী!

ক' দিন আগেই, ওড়িশায় সুপার সাইক্লোন বয়ে গেছে। কত লোক মরেছে। কেউ আজও সঠিক জানে না। তারপর থেকেই গোলদারের কথা গুলদার ভেবে উড়িয়ে না দিলেও একটা ভয় ঢুকে গেছে, প্রকৃতি খামখেয়ালি হয়ে উঠেছে। কলকাতাও ভুবনেশ্বরের মতো হয়ে যাবে একদিন।

আমার বউ আবার বলল, এই রোদ ঢোকাটা কুলক্ষণ।

আমার সব কথায় বউয়ের, বউয়ের সবকথায় আমার প্রতিবাদ করা অভ্যাস। বললাম, সুলক্ষণ তো বলা উচিত।

— না, তোমার সঙ্গে থাকতে আমার ভাল কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

— আমার ও এককথা।

বউ খুব রেগে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে 'ডায়াল' খুলে বসল। খুব রেগে গেলেই বউ এটা করে। উকিলদের নম্বর টুকে। গত বছরে অন্তত তিনশ তেত্রিশ বার ও নম্বর টুকেছে। আজও টুকল। টুকে তারপর ফোন করার জন্য বসল।

আমি বললাম, ফোনের বিল আমি দিই। সুতরাং আলফাল ফোন করতে আমি দেব না।

— এটা মোটেও আলফাল ব্যাপার নয়। এটা খুবই সিরিয়াস ব্যাপার। তোমার সঙ্গে কোন ভদ্রমহিলা একদন্ডও কাটাতে পারে না।

— তুমি কি ভদ্রমহিলা? আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললুম।

—তবে কী?

-- নিজেই বোঝ!

এবার যা ঘটার তাই ঘটল। বউ 'ডায়াল' ছুঁড়ল। ফোন ছুঁড়ল। টিভির রিমোট ছুঁড়ল। তারপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। আমার বউ সুপার আধুনিক। বরং পোস্ট মডার্নই বলা যায়। বউ

অবশ্য বলে, সে পোস্ট মর্ডার্ন নয়, উত্তর আধুনিক। দু'টোর মধ্যে যে কি তফাৎ, সেটা নাকি আমার মত লোকের বোঝার ক্ষমতা নেই।

তো এই বউ যখন কাঁদে, আমার সেকেলে মায়ের মতই করে। পা ছড়িয়ে কাঁদে আর গজগজ করে আমার ততোধিক সেকেলে ঠাকুমার মতো।

এই কান্না কতক্ষণ চলতে পারে, আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলুম। কোনটা করলে ঠিক হবে, মনে মনে সাজাচ্ছিলুম।

এক. একটু ঘুরে আসা

দুই. ধমকানো, কান্নার জন্য (তাতে অবশ্য কোন লাভ নেই)।

তিন. বলা, আমার ভুল হয়েছে (তাতে, কান্না থামবে । কিন্তু ঘ্যানঘ্যান চলবে)।

এই সব সাত পাঁচ ভাবছি। আর বউয়ের কাঁদুনি চলছে। কখনও ফুঁপিয়ে, কখনও জোরে।

এই সময় বেজে উঠল ফোন। বাঁচলুম। ওপাশে সন্দীপন।

--- শোনো, দারুণ খবর আছে! গলায় উত্তেজনার ছোঁয়া।

(বউ ফোঁপানি থামিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে, ফোনটা কার? কোন মহিলার কিনা?)

-- খবরটা কি?

— আরে, সরকার আমাদের এরিয়ারের সব টাকা দিয়ে দেবে বলেছে।

-- সে তো অনেক দিনই শুনছি।

— নানা এটা পাকা খবর। ওয়েব কুটা আজ ১১টায় মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল, মন্ত্রী বলেছেন - সামনের সপ্তাহে টাকা পৌঁছে যাবে কলেজে

--- ধ্যাৎ, অবিশ্বাস্য! শালারা এত ভাল হতেই পারে না।

অবিশ্বাসের সুর গলায়।

-- দ্যাখো, বিশ্বাস কর না করা তোমার ব্যাপার। একটু ক্ষুণ্ণ শোনাচ্ছে সন্দীপনের গলা। তবে তুমি এটাকে কী বলবে, এটাও মিথ্যা!

--কোনটা?

--- আমার মেয়ের ডাক্তারের ব্যাপারটা।

— কেন কী হয়েছে তোমার মেয়ের ডাক্তারের?

— আরে না, ডাক্তারের কিছু হয় নি, হয়েছে আমার মেয়ের।

— সে তো জানি।

— তো, মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। দ্যাখানোর পর ফি দিতে গেলুম। ডাক্তার নিল না।

— কেন?

— আরে সেটাই তো অবাক কান্ড। তিনশো টাকা ফি! আমি তো ভাবছিলাম, ভোট এবং পুজোর পর সব জিনিসের দাম চড়া, ডাক্তারের ফি ও হয়তো বেড়েছে। তাই পকেট থেকে আরও একটা একশো টাকা বার করলুম। ফ্ল্যাটের বর্গফুট আর ডাক্তারের ফি তো শ'য়ের কমে বাড়ে না। কিন্তু ডাক্তার বাবু বললেন, না না কোন ফিস্ লাগবে না। আমি বল্লাম, কেন, আমি তো কলেজে পড়াই, মাইনে পাই; যাদের পয়সা নেই তাদের কাছে নেবেন না, আমার কাছে কেন নেবেন না।

ডাক্তার বাবু জবাবে বললেন, না, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর ফিজ্ নিয়ে চিকিৎসা করব না। আমাদের সংগঠনের সঙ্গে সরকারের কথা হয়েছে এবার থেকে সরকারই সব চিকিৎসককে মাসে মাসে টাকা দেবে। আমি তো শুনে আঁতকে উঠলুম, তার মানে আপনার চেম্বার উঠে যাবে ডাক্তারবাবু বললেন, না, তা কেন, চেম্বার থাকবে, কিন্তু ফিজ্ থাকবে না।

সন্দীপনের দীর্ঘ সংলাপে একটু ক্লান্তি আসছিল। একই সঙ্গে অবাক ও হচ্ছিলাম, তাই শুনে যাচ্ছিলাম। সন্দীপন বোধহয় বুঝতে পারছিল আমার মুড। তাই বলল, রাখছি।

আসলে, আমার তখনই খবরটা যাচাই করতে ইচ্ছে করছিল। তাই ফোন করলাম, কৌশিককে। কৌশিক ডাক্তার। কৌশিক নেই। ওর বউ সরোজ জানাল, ও এখন ভুবনেশ্বরে। এবার ফোন সুরঞ্জনকে। সুরঞ্জন ও ডাক্তার। ওর বউ অনুশীলা জানাল খবরটা ঠিক। শুধু তাই নয়, অনুশীলা দিল আরও একটা অবাক করা খবর।

অনুশীলা বলল, জানেন বাজারে সব জিনিসের দাম কমে গেছে। বাবা আজ বাজার থেকে ফিরে এসে বললেন, বাজারে সব জিনিসের দাম দারুণ কমে গেছে। নাকি, ৭৭ - ৭৮ সালের মত হয়ে গেছে।

—বল কী?

পাশ থেকে এই সময় সুরঞ্জনের বোন সহেলী কিছু বলার চেষ্টা করছিল। আমি এ পাশ থেকে শুনতে পেয়ে বললুম, ও কী বলছে।

জবাবে অনুশীলা বলল, ও যা বলছে আপনি হয়তো সেটা জানেন।

- কী জানি—

—না, ওই যে আনন্দবাজারে আজ জানিয়েছে না, পাত্র - পাত্রীর সব বিজ্ঞাপনে 'দাবি নাই' না লিখলে তারা বিজ্ঞাপন ছাপাবে না।

— তাই নাকি! বিস্মিত আমার প্রশ্ন।

— ও মা আপনি জানেন না বুঝি! ওরা তো বলেছে। বিজ্ঞাপনে ঠিকুজি, কোষ্ঠী , জাতপাতের কথা থাকলেও সেই বিজ্ঞাপন ছাপাবে না।

আমি আজ বাজার যাই নি, আর যুদ্ধের খবর ফলাও করে লেখার পর থেকে আমি আনন্দবাজার কিনি না।

অনুশীলার কথা শুনে আমি এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার মুখ থেকে কথা সরছিল না। আমাকে কোন কথা বলতে না দেখে অনুশীলা জিজ্ঞেস করল, কি বিশ্বেস হচ্ছে না!

আমি কোন ক্রমে বললুম, না তা কেন, তা কেন?

ফোনটা নামিয়েই আমার মনে হল, আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। জেগে নেই । তাই বউকে বললুম, আমাকে চিমটি কাটো তো জোরে।

বউ বলল, মরণ!

আমি বললাম, দ্যাখো তো আমি জেগে আছি না ঘুমচ্ছি।

বউ উঠল খেঁকিয়ে। বলেছিনা তোমার মাথায় ছিট আছে।

এটুকু বলেই থামার পাত্রী আমার বউ নয়।

বলল, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, কাঁদিয়ে, তারপর ডাবড্যাব করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, আমি ঘুমাচ্ছি না জেগে আছি।

বউয়ের তারাবাঁকা কথায় সব মনে পড়ে গেল। আমি সবকিছু যাচাই করার জন্য ফোন করলাম দেবাশিসদাকে। দেবাশিসদা বড় সাংবাদিক। অনেক খবর রাখেন। অনেকক্ষন রিং বাজার পর ফোন ধরলেন। ফোন ধরেই বললেন, এক্ষুনি টিভি খুলুন। স্টার নিউজ। দারুণ খবর আছে। পরে ফোন করছি।

পড়িমরি করে টিভি খোললুম—

দেখলুম, মুখ্যমন্ত্রী ভাষন দিচ্ছেন। রাইটার্সের মাথা থেকে। বলছেন—

ব্যালট নয়, বুলেটও দরকার।

আমাদের বিপ্লব করতে হবে— বিপ্লব।

আমি টিভি বন্ধ করে, বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, আজ আমি তোমার সঙ্গে একমত।

—কীসে?

—পৃথিবী শিগ্‌গিরই ধ্বংস হয়ে যাবে।

—কেন?

আমি একগাল হেসে বললুম,

এত সুখ সইবে না গো!

আশ্রম কন্যা

রীনা চক্রবর্ত্তী

আজ দুপুরে লেটারবক্সটা খুলেই অবাক হয়ে গেল অপর্ণা। তার নামে একখানা চিঠি এসেছে। গত তিন বছরের মধ্যে কেউ তাকে চিঠি লেখেনি। এখানে প্রথম এসে সেই বরং তার সঙ্গী সাথীদের চিঠি লিখেছিল। খামটা খুলে দেখল অনাথ আশ্রম থেকে চিঠিখানা লিখেছেন তার শ্রদ্ধেয় জ্যোৎস্নামা, যাঁর আশ্রয়ে সে ওখানে কুড়িবছর কাটিয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নামা লিখেছেন আশ্রমে এসে একবার সকলের সঙ্গে দেখা করতে। বিয়ের পর সে ওখানে যায় নি একবারও। সকলের তাই মনে হয়েছে অপর্ণা তাদেরভুলে গেছে। তাঁর ধারণা অপর্ণা তার স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাই অতদূর থেকে আসতে পারে না। এবার আশ্রমের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসবে তাকে আসতে অনুরোধ করেছেন এবং সম্ভব হলে কিছু অর্থসাহায্য করতে বলেছেন তাঁর এক আশ্রম কন্যা সুজাতার বিয়েতে। সুজাতা সেই ছোট্ট ফুলের মত মেয়েটা। এতদিনে তার বোধ হয় আঠারো বছর বয়স হয়েছে।

এই তিন বছর ধরে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করছে অপর্ণা। এখানে তার শ্বাশুড়ির খুব নাম ডাক। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। সমাজের নিপীড়িতা নারীদের নিয়ে তিনি বিশেষ করে চিন্তা ভাবনা করেন। সেই ব্যাপারে প্রায়ই বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দিতে এ দেশ সে দেশ চলে যান। একা অপর্ণাই সংসার সামলায়। শ্বশুর বাড়ির অবস্থা ভালো। কলকাতার বাগড়ি মার্কেটে তার স্বামীর ওষুধের ব্যবসা আছে।

চিঠিটা পড়া অবধি অপর্ণার মনটা হু হু করতে থাকে। ডেকচিতে দুধ ফুটে উথলে পড়ে পোড়া গন্ধ ছড়ায়। উনুনের ধারে বসে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ে যায় কৃষ্ণনগরে তাদের সেই স্বর্গীয় আশ্রমের কথা। জ্ঞান হয়ে অবধি এই আশ্রমে মানুষ হয়েছে সে। সেই ভোরবেলা ওঠা, সমবেত ভাবে প্রার্থনা করা, প্রাতরাশ খেয়ে পড়তে বসা, হাতের কাজ করা, তাছাড়া সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গান করা। খাবার সময় পালা করে সকলকে পরিবেশন করা, বাচ্চাদের পড়ানো, রান্নাঘরে সবাইকে সাহায্য করা। কী আনন্দে দিনগুলো কাটত তখন তার। তার নিজের বাবা মাকে সে জানত না। জ্যোৎস্নামা ছিলেন তাদের সকলের মা। সবাইকে তিনি ভালোবাসতেন নিজের মেয়ের মত। অপর্ণা বড় হয়ে শুনেছে এই জ্যোৎস্নামা ছিলেন খুব বড়লোকের ঘরের বৌ। অকালে তিনি তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন। তাঁর একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। সেও বেশী দিন বাঁচল না। তাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় গড়ে তুলেছিলেন এই আশ্রমটি। অনাথ কন্যারা তাঁর আশ্রমে আশ্রয় পায়। অপর্ণারও সেই আশ্রম, তার সঙ্গী সাথী, দিদিমনিদের ভালোবাসা, আশ্রমের গরু বাছুর, গাছপালা, ছাগল ছানা, সব কিছুকেই বড় আপন বলে মনে হত। এদের ছেড়ে চলে যেতে হবে এ কথা কোনও দিনও সে ভাবেনি।

দুধের ডেকচিটা নামিয়ে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে সে নীরবে কাঁদতে থাকে। মনে পড়ে যায় তিন বছর আগেকার সেই দিনটার কথা। তার শ্বাশুড়ি এসেছিলেন তাদের আশ্রম দেখতে। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মহিলা, খবরের কাগজের রিপোর্টার, পাড়ার এম. এল. এ এবং আরও কিছু লোকজন ছিল। জ্যোৎস্নামার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আশ্রমটা দেখাচ্ছিলেন শ্বাশুড়ি। হঠাৎ অপর্ণার দিকে

চোখ পড়তেই চোখ যেন আটকে গেল তাঁর। জ্যোৎস্নামার ঘরে বসে কি সব আলোচনা হল। তার দিন দশেক পরেই কিছু লোকজন আর নিজের ছেলেকে নিয়ে আশ্রমে হাজির হলেন তিনি। সাংবাদিক, পুরোহিত, এম.এল. এ. আর পাড়ার লোকজনকে সাক্ষী রেখে তাঁর ছেলে অমরনাথের সঙ্গে আশ্রমকন্যা অপর্ণার বিয়ে দিলেন। শ্বাশুড়ির এই মহৎ কাজের জন্য চতুর্দিকে জয় জয়কার পড়ে গিয়েছিল সেদিন। এই ঘটনার কথা বিভিন্ন কাগজেও বেরিয়েছিল। আশ্রম ছেড়ে চলে আসার সময় জ্যোৎস্নামা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন "অপর্ণা তুই বড় ভাগ্যবতী। তাই এতবড় ঘরের বৌ হলি। দেখিস আমাদের যেন ভুলে যাস না।" চোখের জল ফেলতে ফেলতে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় এসে নেমেছিল অপর্ণা।

প্রথম দিকে শ্বশুর বাড়ির হালচাল সে বুঝতে পারত না। টাকা পয়সা যে এদের আছে সেটা বুঝেছিল। খাওয়া পরার কোন ও কষ্ট নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা পয়সাও কেউ তার হাতে দেয়নি। মুখ বুজে কাজ করে অর্পনার সারাদিন কাটে। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে একটি বিনা পয়সার দাসীর দরকার ছিল এঁদের। সেই জন্যই লোক দেখিয়ে তার শ্বাশুড়ি অর্পনাকে অনাথ আশ্রম থেকে এনে ঘরে তুলেছিলেন। আশ্রমের মেয়ে অপর্ণা। খুব বেশী সাজগোজ করা তার ধাতে ছিল না। তবুও শ্বাশুড়ি পাঁচজনকে দেখিয়ে কতকগুলো গয়না আর ভালো শাড়ি পরিয়ে মাত্র সাত আট দিন তাকে একটু আরাম করতে দিয়েছিলেন। তারপর সে সব শাড়ি গয়না ফেরৎ চেয়ে নিয়েছিলেন। ভোর থেকে উঠে খাটতে খাটতে কোথা দিয়ে দিন রাত কেটে যায় তার কোনও হিসেব থাকে না অর্পনা'র।

শ্বাশুড়ি যখন বাড়ি থাকেন, তখন তাঁর সাংঘাতিক দাপট। ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে সকলে। পান থেকে চুন খসলেই চিৎকার করে গালাগালি দেন। অপর্ণা ও তাঁর তিরস্কার থেকে রেহাই পায় না। দিনে দিনে সে বুঝতে পারে তার স্বামী একজন নেশাখোর, তা ছাড়া তার বার দোষ ও আছে প্রায় রাত্রেই সে বাড়ি ফেরে না। ছেলেকে ঘরে ফেরাতে সুন্দরী বৌ এনেছেন মা। তাতে ও ছেলের মতিগতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। গভীর রাতে তাঁর ছেলে নেশায় বুঁদ হয়ে বাড়ি ফেরে অশ্লীল ভাষায় অর্পনাকে গালিগালাজ করে। মদের গন্ধে বমি আসে অপর্ণার। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মাতাল অবস্থায় লোকটা বিছানায় ঘুমে বেহুঁশ হয়ে গেলেই অপর্ণা মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে।

বিয়ের একবছর পর অপর্ণা একবার আশ্রমে যেতে চেয়েছিল। সকলের জন্য তার বড় মন কেমন করছিল। তাই শুনে শ্বাশুড়ি বলেছিলেন তার যখন মা বাবা কেউ নেই তখন কোথাও যাবার রাস্তা তার বন্ধ। আশ্রমে যাবার কথায় খুব রেগে উঠে তাঁর বাড়ির বৌ হওয়ার পর অপর্ণা যেন ওই অনাথ আশ্রমের কথা আর মুখেও না আনে। সমাজে তাঁর মান সম্মান আছে।

শ্বশুর বাড়ির পাশেই একটা বাড়ি আছে। ছাদে উঠলে সে দেখতে পায় তারই বয়সী একটি মেয়েকে। মেয়েটির নাম রঞ্জনা। সে খুব লেখাপড়া জানে। এখন বাংলায় এম. এ. পড়ছে। শ্বাশুড়ি আর স্বামী বাড়িতে না থাকলে ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে বিকেলবেলা গল্প করে। মেয়েটি লুকিয়ে অপর্ণাকে অনেক বই, পত্রপত্রিকা পড়তে দেয়। অপর্ণা দরজা বন্ধ করে সেইসব পড়ে।

সেই পড়াটুকুতেই তার যত আনন্দ। রঞ্জনা জানে অপর্ণার জীবনের ইতিহাস, তাই তার দুঃখে সে সমবেদনা জানায়। অপর্ণা সেই মেয়েটাকে নিজের বোনের মত দেখে।

রঞ্জনার কাছে অপর্ণা জেনেছে তার শ্বাশুড়ি নাকি বাঙালি নয়। আসলে তিনি একজন বিহারী। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল সুপ্রিয়া যাদব। বাঙালী পরিবারে এসে বাঙালিআনা রপ্ত করলেও তাঁর কথা বলার মধ্যে সামান্য অবাঙালী টান এখন ও থেকে গেছে। অপর্ণা এই নিয়ে একদিন প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর বাপের বাড়ি দ্বারভাঙায়। বিহারে মানুষ হয়েছেন বলেই তাঁর ভাষা একটু বেঁকে গেছে। তাঁর খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ও অপর্ণা লক্ষ্য করেছে যে তিনি ভাতের বদলে রুটি, পুরি, ডাল , সবজি এইসব পছন্দ করেন। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন তাঁর নাকি ব্লাডসুগার আছে। তাঁর জন্য এইসব রান্না বান্না অপর্ণাকেই করতে হয়। তাছাড়া সে দেখেছে কিছু বিহারী লোক মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে যাতায়াত করে। শ্বাশুড়ি তাদের সঙ্গে চোস্ত হিন্দিতে কথাবার্তা বলেন। তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ মাছ মাংস খায় না। অপর্ণা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সে একদিনও মাছ ভাত খেতে পায়নি। রঞ্জনা একদিন চুপিচুপি তাকে একটা মাছ ভাজা খাইয়েছিল।

শ্বাশুড়ি একজন বিখ্যাত মহিলা। সুপ্রিয়া রায় নামে তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। বিশেষ করে নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সরব। এর জন্য তিনি একটি মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছেন। নারী মুক্তির ব্যাপারে তিনি সর্বত্র আন্দোলন করে বেড়ান। শ্বশুর বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী। তাঁর সেবাও অপর্ণাকেই করতে হয়। সংসারের কাজে কোনও ত্রুটি হলে শ্বাশুড়ি গালাগালির বন্যা ছোটান। তখন তাঁর ভাষার মধ্যে বিহারী ভাবটা পুরোপুরি ফুটে ওঠে।

তিনবছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করতে করতে শরীর ভেঙে গেছে অপর্ণার। তার পেটে একবার বাচ্চা এসেছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করার ফলে দু মাসের মধ্যেই বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় কিছুদিনের জন্য সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এত দুঃখের মধ্যে ও তখন সংসারের অবস্থা দেখে তার হাসি পাচ্ছিল। শ্বাশুড়ির চিৎকার আরও বেড়েছিল। শ্বশুর ও ভালো করে খেতে পাচ্ছিলনা। সেই সুযোগে তার স্বামীও ঘরে ফিরত না। অপর্ণা বিছানা থেকে উঠে আবার যখন সংসারের হাল ধরল তখন তার শরীর বেশ রোগা হয়ে গেছে, রং পুড়ে গিয়ে চোখের নীচে কালি পড়েছে। সব সময় মাথা ঘোরে। মনে হয় তার প্রাণ শক্তি যেন দিন দিন ফুরিয়ে আসছে। অথচ তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না।

এই ভাবেই কাটতে থাকে তার জীবন। এর মধ্যে আজ জ্যোৎস্নামার চিঠিটা পেয়ে লাভার স্রোতের মত তার মনের যত বেদনা আর অশ্রু হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসতে লাগল। অপর্ণা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সন্ধ্যাবেলা শ্বাশুড়িকে বলল "মা, আমি অনাথ আশ্রমে একবারটি যেতে চাই।" সেই সঙ্গে জ্যোৎস্নামার চিঠিটা দেখাল ভয়ে ভয়ে। এতদিন পর আবার অনাথ আশ্রমে যেতে চাইছে অপর্ণা। তার জন্য টাকা চাইছে। তাছাড়া সেই মেয়েছেলেটাই বা তাকে চিঠি লেখে কোন সাহসে? আগুনে ঘি পড়ার মত হঠাৎ জ্বলে ওঠেন শ্বাশুড়ি। চিৎকার করে বলেন "না। ওই অনাথ আশ্রমে তোমার আর যাওয়া চলবে না। আমি না হয় একশো টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব। তুমি যেমন সংসারের কাজ করছ করে যাও। বাপ, মা নেই দেখে

তোমায় আনলাম, অনাথা অবস্থা থেকে মুক্তি দিলাম, আবার সেখানকার জন্য দরদ উথলে উঠল তোমার?"

অপর্ণা নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যায়। তারপর রাত জেগে জ্যোৎস্নামাকে একখানা চিঠি লেখে। সেই চিঠিতে সে তাঁকে জানায়,

"শ্রী চরণেষু মামনি,

আপনি আমাকে আশ্রমে যাবার কথা লিখেছেন। কিন্তু এখান থেকে আমার যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমার হাতে টাকা পয়সাও কিছু নেই। আমাকে বিদায় দেবার সময় আপনি বলেছিলেন "তুই বড় ভাগ্যবতী", কিন্তু আজ আমার চাইতে অভাগী আর কেউ নেই। আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করছি মামনি। আপনি দয়া করে আমার মত কোনও আশ্রম কন্যার বিয়ে আর দেবেন না। তার চেয়ে বরং তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজেদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করুন। আমি অন্তর থেকে বলছি আমার জীবন বলি হলেও আর কারও যেন এ রকম দুর্ভাগ্য না হয়। আপনি আমার প্রনাম নেবেন। ইতি

অপর্ণা"

চিঠিখানা খামে ভরে ঠিকানা লিখে পরের দিন সে রঞ্জনার হাতে পোস্ট করতে দেয়।

এর দুদিন পর খবরের কাগজে প্রকাশিত হল একটি ছোট্ট সংবাদ।

"প্রখ্যাত সমাজ সেবিকা শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়ের পুত্রবধূ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায় নি। সুপ্রিয়া দেবী তার পুত্রবধূকে মেয়ের মত স্নেহ করতেন। বছর তিনেক আগে তাকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে নিজের কৃতী সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই ঘটনার ফলে তিনি নিদারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছেন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের জানা নেই।"

অনুরণন

রুমা পাল

তৃষা যখন রাজর্ষিকে প্রথম দেখেছিল ওর মনে কোন অনুভূতিই জন্ম নেওয়ার কথাও নয়। রাজর্ষি নামটার মধ্যে রাজা রাজা গন্ধ থাকলেও আক্ষরিক অর্থে ওর মধ্যে একটা ঋষিসুলভ উদাসীনতা আছে। ডাক নাম রাজা, কেউ কেউ রাজু বলে। উঠতি বয়সে আড়ালে আবডালে অনেকে রাজু মস্তানও বলত। এও ওর অজানা নয়। যদিও ওকে অনেকে মস্তান বলত, কিন্তু মস্তান সুলভ চেহারার বাঁধুনি, ওর শরীরে সেই অর্থে নেই। কিন্তু ওর একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে যেটা দিয়ে ও যে কোন মানুষকে অভিভূত করতে পারে। সেই ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি হচ্ছে ওর দুটো চোখ। ওর চোখে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা। কখনও ঐ চোখে রাগের আগুন, কখনও বা সমুদ্রের অতলান্তিক গভীরতা, কখনও কিছুই বোঝা যায় না। হয়তো ওর চোখ দেখে যখন কেউ পরম আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে বলে বুঁদ হয়ে যাবে তখনই হয়তো ও নির্মম আঘাতে আশ্রয় প্রার্থীকে সরিয়ে দেবে। এই রাজা যে শুধুমাত্র চাহনি দিয়ে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে এসেছে গত কুড়িটা বছর ধরে, সেই রাজা তৃষা নামে এক সাধারণ, অতি সাধারণ মেয়ের জন্য পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এমন করে তৃষাতুর হয়ে পড়বে কে ভেবেছিল?

গল্পটার শুরু এখান থেকে, তৃষার স্বামী আর মেয়েকে নিয়ে তৃষা এই পাড়ায় বাড়ি কিনে ঠিক কবে এসেছিল সে কথা রাজা জানে না। তৃষার স্বামীর বছর চল্লিশ বয়স, তৃষার বয়স আন্দাজ করা যায় না। এক একটা মেয়ে থাকে যাদের বয়স তারা নিজেরা না বলে দিলে বোঝা যায় না। ত্রিশ হতে পারে পঁয়ত্রিশও হতে পারে। কিন্তু বয়সে কিবা আসে যায়?

কসবার এই সদ্য গড়ে ওঠা পাড়ায় ওরা একটা চালা বাড়ীতে উঠে এল। চালা বাড়ীটা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক বিপত্নীক। একটি মাত্র ছেলে, স্টেটসে সেটেলড্, বাপকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়ে যেতে চাইছে। উনি চাইছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ একটা অ্যাটাক হয়ে যাবার পর কেন জানি না অপত্যস্নেহের প্রবল স্রোতে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবার মত মনের জোর পেলেন না। তাই মোটামুটি একটা দামে বাড়িটা বিক্রি করে ছেলের কাছে চলে যাবার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিলেন। কারণ এই বাড়ি আঁকড়ে পড়ে, থাকার আর কোন কারণ নেই। কার জন্যই বা থাকবেন, ছেলে ওখানকার মেয়ে বিয়ে করেছে। ওখানেই থেকে যাবে। কলকাতায় ফিরে আসবার ইচ্ছা থাকলে এই চালাবাড়ী কবেই বিশাল রাজপ্রসাদ হয়ে যেত।

তৃষার স্বামী ভদ্রলোকটির বাহ্যিক ব্যবহার খুবই আমায়িক, খুবই সুপুরুষ দেখতে। কিন্তু চোখের দিকে তাকালে কেমন যেন ভয় ভয় করে। মনে হয় এই ভদ্রলোক যদি মনে করেন, যে কোন মানুষকে এক মুহূর্তে খুন করতেও দ্বিধা করবেন না। গড়িয়াহাটের দিকে মোজাইক মার্বেল পাথরের বিশাল দোকান। পয়সা অঢেল। ভবানীপুরে বিশাল পৈতৃক ভিটে। বাড়ীতে বাবা, দাদা, বৌদি, শুভ, দাদার একমাত্র ছেলে, স্ত্রী তৃষা আর মেয়ে কোয়েলকে নিয়ে একত্রে বাস করতেন। ভবানীপুরের ঐ বনেদী বিশাল বাড়ীতে আরও কিছু লোক হেসে খেলে থাকতে পারে। মা নব্বই বছরের বৃদ্ধা, তিনতলায় ঠাকুর ঘর আর বারান্দায় বসে কাটাতে ভালবাসেন। শুভ দেরাদুনের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। দুতিন বছর পরে আই সি এস ই দেবে । দাদা মেরিন

ইঞ্জিনীয়ার । বছরের আটমাস জাহাজে জাহাজে ভারতের বাইরে থাকেন। বিশাল বাড়িতে লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। তবুও এই বিশাল বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কসবার এই চালাবাড়ি কিনে কেন তৃষা আর অলকেশ মেয়ে কোয়েলকে নিয়ে চলে এল সেকথা রাজার মনে অন্যান্য প্রতিবেশীর মত অনেকদিনই জেগেছিল। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করতে না দেওয়াই ভদ্রলোকের কাজ। রাজাও নিজেকে ভদ্রলোক প্রমাণ করবার জন্য বেশ অনেকদিন ধরেই কোন কৌতূহলই দেখাই নি।

রাজা কনট্রাকটর। মোটামুটি সস্তায় বালি, সিমেন্ট, ইঁট, পাথর কিনে মিস্ত্রি খাটিয়ে নিজের রুচি পছন্দ মাফিক বাড়ী তৈরী করিয়ে দেয়। এতে তাদের লাভের মাত্রা ভালই থাকে। রাজার রুচিরও প্রত্যেকেই প্রশংসা করে। প্রথমে এই ব্যবসা করবে এরকম কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চাকরী না পেয়ে বাবার কাছে কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। আজ সে বেশ কয়েক লাখ টাকার মালিক। বছর পঁয়ত্রিশের রাজা সুপুরুষ না হলেও কুৎসিত কেউ বলবে না। আর টাকা থাকলে আবার পুরুষের রূপ কে দেখে? কিন্তু রাজার এখনও বিয়ে করা হয় নি। কারণ ও বিয়ে করে বন্দী জীবনে যেতে চায় নি। তাছাড়া সব মেয়েকেই ওর খুব স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক , লোভী আর নিজের দখলে পুরুষকে রাখতে ভালবাসে বলে মনে করে। তাই মেয়েদের ও ভালবাসেইনা। এমন কি ঘৃণা করার জন্য একটা মেয়ের কাছাকাছি গিয়ে তাকে জানা বোঝার চেষ্টা করাতেও ওর আপত্তি। ও মেয়েদের অবজ্ঞা করে। কেন না ওর মতে মেয়েরা নেহাৎই অবহেলার পাত্রী। ওদের সাথে কথা যদি দু মিনিট বলা হয় তো সেই দু মিনিটই নষ্ট। নষ্ট করার মত সময় রাজার নেই।

একদিন রাজা বাড়ীর বৈঠক খানায় বসেছিল। অলকেশ সরকার ওর সাথে দেখা করতে এল। রাজা একটু অবাকই হল। কিন্তু মুখের ভাব গোপন রেখে ও অলকেশকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। আরে, আসুন, আসুন, অলকেশ বাবু।

রাজর্ষি বাবু।

আমাকে রাজা বলুন, অতো বাবু টাবু শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। লোক চরিয়ে খাই, মিস্ত্রি মজুরদের সাথে থাকতে থাকতে আমি নিজেও একজন মিস্ত্রিই।

ইতিমধ্যে অলকেশ সোফায় আসন দখল করে নিয়ে দামী সিগারেট নিজে নিয়ে রাজাকেও একটা অফার করেছে।

বলুন, এই অধমের কাছে কি দরকারে? রাজার সহাস্য প্রশ্ন।

দরকার তো অনেকটাই ভাই। আপনিই পারবেন ঠিক ঠিক দায়িত্ব পালন করতে।

কিন্তু দরকারটা কি সেটাইতো জানতে পারলাম না। ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে কাজের মেয়ে চা বিস্কুট দিয়ে গেছে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি আপনাদের কয়েকটা বাড়ি পরে একটা চালা বাড়ি কিনেছি। ঐ বাড়িটাকে আপনি আপনার মনের মত করে ভেঙে তৈরী করে দিন। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

কিন্তু এ পাড়াতে আমি ছাড়াও আরও একজন প্রবীণ কনট্রাকটর আছেন। তিনি থাকতে

আবার আমি কেন? রাজা বিনয়ী হবার চেষ্টা করে।

সে আমি জানি। কিন্তু আমি শুনেছি যে আপনার একটা নেশা আছে। যখন আপনি কোন বাড়ি তৈরি করান, কখনও ভাবেন না যে অপরের বাড়ি করছেন। নিজের মত করে করেন। বুঝতেই পারছেন আমি ব্যবসায়ী মানুষ, সময় একেবারেই নেই। তাছাড়া ভবানীপুরে আমার বৃদ্ধা মা থাকেন। দাদা বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকেন। আমাকে মাঝে মাঝে ওখানেও থাকতে হয়। তাই বাড়ির ব্যাপারে আমি শুধু টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চাই।

কিন্তু আমাকে এতোটা বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে কি?

ভাই, একটা কথা বলি শুনুন, আপনি আপনার লাভ হয়তো একটু বেশী রাখবেন। তা ঈশ্বরের দয়ায় আমার টাকার অভাব নেই। রুচি, টুচি আমার একেবারেই নেই। তবে তৃষা, মানে আমার স্ত্রী আবার শিল্প, রুচি এগুলো দিয়েই তৈরি। কেউ কোনো রুচিসম্মত কাজ করলে ও তার খুবই প্রশংসা করে। যাক, বাড়িটায় বুঝতে পারছেন তো আমার একমাত্র মেয়ে কোয়েলই ভবিষ্যতে থাকবে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কাছে, আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করুন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

অলকেশ সরকার নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

তারও দিন দুয়েক পরে এক রবিবার সকালে রাজা বাড়ির অবস্থাটা দেখতে এল। যদিও এ পাড়ায় রাজা থাকে কিন্তু সেইভাবে বাড়ির ভেতর এসে কোনদিন খুঁটিয়ে দেখেনি। আজ যখন সকালে কড়া নাড়ল তখন বাড়ির দরজা তৃষাই খুলে দিল।

অলকেশ বাবু আছেন

না, উনি বেরিয়েছেন। তৃষা মৃদু হেসে উত্তর দিল।

কিন্তু আজতো রবিবার।

তৃষা হঠাৎই চোখটা নামিয়ে নিয়ে খুব মৃদু স্বরে বলল, উনি আজ ভবানীপুরে গেছেন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে তো ওর মা থাকেন। হ্যাঁ তা আমি আজ বাড়িটা দেখতে এসেছি। কবে থেকে কাজ শুরু করব?

আপনি ইচ্ছা করলে কাল থেকে শুরু করতে পারেন। হ্যাঁ, উনি এই চেকটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন। তৃষা একটা এক লাখ টাকার চেক রাজার হাতে দেয়। ইতিমধ্যে কোয়েল মার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে।কোয়েল বছর তিনেকের ফুট ফুটে মেয়ে। কিন্তু মা, মেয়ে দুজনকে দেখে এক মুহূর্তে রাজার মনে হল কি যেন একটা চাপা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে ওদের মনের ভেতর।

যাক ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। টাকা নিয়ে ব্যাপার। পার্টি সাধারণতঃ প্রথমেই এত টাকা হাতে দেয় না। চাপ দিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করতে হয়। অনেক সময় এমন হয়েছে রাজা নিজের টাকায় বাড়ী করে দিয়েছে। তারপর পার্টি সেই টাকা দিতে তার জুতোর শুকতলা ঘুইয়ে দিয়েছে। অলকেশ সরকার সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই ভদ্র।

আজ তাহলে আসি। রাজা চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

একটু চা খেয়ে যান। আপনি তো একটু বসলেন না। তৃষা খুব কষ্ট করে যেন কোন এক

যন্ত্রণা লুকিয়ে রেখে কথা কটা উচ্চারণ করল।

না, না, আজ থাক, কাল থেকে তো আসছিই, তখন চা খাওয়া যাবে। আজ আসি।

রাস্তায় এসে রাজার কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। কোন মেয়ের প্রতি রাজার কোন রকম দুর্বলতা নেই। এতো একজনের বউ, অতি সাধারণ এক নারী। তবে রাজার ভাবতে অবাক লাগে অলকেশবাবুর মত একজন সুপুরুষ বনেদী চেহারার ধনীলোক কি করে এত সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করল, যাক, গে ঐ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কিন্তু সারাদিনই কাজের মাঝে মাঝে তৃষার বিষণ্ণ চোখ দুটো রাজার মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেল।

পরের দিন থেকে রাজা কাজে লেগে গেছে। এর মধ্যে অলকেশ বাবু একদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে রাজাকে একটা ব্লাঙ্ক চেক সই করে দিয়ে বললেন,

আপনি এই চেকটি রাখুন। যখন যেমন দরকার নিয়ে নেবেন।

রাজা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বলে ওঠেন, কি করবেন কিছু এক্সট্রা টাকা নেবেন। হয়তো পুরো টাকাটাই আত্মসাৎ করবেন। তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না মশাই। সমুদ্রে ঘটি ডুবিয়ে জল নিয়ে সমুদ্রের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়?

রাজা ভদ্রলোকের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বাড়িটা গড়ে উঠছে। এত টাকা হাতে নিয়ে কাজ করার সুযোগ রাজা কোন দিনই পায়নি। ওর যা কল্পনায় ছিল, স্বপ্নের রাজপুরী করা ও আস্তে আস্তে তাই করা শুরু করল। মাঝে মাঝে ছোট্ট কোয়েল আসে। পূর্বদিকে একটা ঘর ভাঙা হয় নি। আপাতত ওখানেই ওরা থাকে। তৃষাকে প্রায় দেখাই যায় না। অলকেশ বলেছিল, তৃষা নাকি শিল্প-রুচির মানুষ। কিন্তু এই যে বাড়িটা আস্তে আস্তে চালা বাড়ী থেকে এক বিশাল স্থাপতের রূপ নিচ্ছে সে ব্যাপারে তার যেন কোন আগ্রহ নেই। একদিনও দেখতে আসে না। দেওয়াল আলমারিটা কোথায় হচ্ছে বা ঝুল বারান্দা রাস্তার ধারে কিনা? রাজার একটু অভিমান হয়। অন্য বাড়িতে যখন কাজ করতে যায়, তখন বাড়ির বউরা এসে তাকে চা জলখাবার দিয়ে যায়। কোন কোন বাড়িতে চাকর বাকর খাবার দিয়ে গেলে ও বাড়ির বউরা খোঁজ নেয় ঠিকমত খেয়েছে কিনা। এ বাড়িটা যেন অন্য একরকম। একটা বুড়ো চাকর আছে, সে নিয়ম মাফিক চা জল খাবার দিয়ে যায় সকলের জন্য। রাজা সকাল আটটায় কাজ করতে আসে। সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত কাজ চলে। বাড়ি যাবার ফুরসত পায় না। সেহেতু অলকেশের বউ বাচ্ছা এই বাড়িতেই রয়েছে, তাই বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজা মনের দিক দিয়ে খুবই ক্লান্ত বোধ করে। এতদিন জানত টাকাই সব। রাজার বেশ কিছু টাকাও হয়েছে। নিজস্ব একটা গাড়ি আছে। সে বিয়ে না করলেও খরচ খরচার শেষ নেই। গরিবদের অর্থসাহায্য, দুঃস্থদের সেবা তো আছেই তাছাড়া ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্না, ভাগ্নী, পুষ্যির কোন অভাব নেই। তার একটা বদ নেশা সময় পেলে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। দেশ-বিদেশ বেড়াবার সময় কাজ বন্ধ রাখতে হয়। তাতে আয়ের পথ বন্ধ থাকে আবার খরচও হয় বেশি। সেই হিসেবে অলকেশের এই কাজটা তার লক্ষ্মীর দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু তবুও রাজার মাঝে মাঝে মনে হয় কাজটা ছেড়ে দেবে। কেন এমন মনে হয় রাজা নিজেও জানে না। তৃষাকে মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে রাজা দেখতে পায়। ঐ হয়তো একবার চোখ তুলে

তাকালো। একটু মৃদু হাসি। তার বেশি কিছু নয়। রাজা মেয়েদের অবহেলার পাত্রী ভাবতো কিন্তু তৃষাকে দেখলে মনে হয় ও পুরুষদের আরও বেশী অবহেলাযোগ্য মনে করে। তৃষাকে দেখে ঠিক ঘরে থাকা অশিক্ষিত কোন গেঁয়ো মেয়ে মনে হয় না। মনে হয় না যে ও কথা বলতে জানে না বলে কথা বলছে না। বরং মনে হয় ওর চোখ দুটো যেন বলছে, তুমি একটা পুরুষ, হয়তো সুপুরুষ হতে পার। কিন্তু আমার সাথে কথা বলার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি আমার স্বামীর দেওয়া টাকায় একটা চাকরের বেশি কিছু নয়। রাজা একটা হীনমন্যতায় ভোগে। কেন তৃষা তাকে অবজ্ঞা করে, কেন এসে একটু কৌতূহল দেখায় না? এই জায়গা কি করবেন, বা , বাঃ এ এখানটাতো বেশ সুন্দর করেছেন? না, তৃষা কিছুই বলে না। সত্যি কথা বলতে কি, মুখোমুখি দেখা না হলে, কেমন আছেন, একথাও জিজ্ঞাসা করে না। অথচ অলকেশ বলেছিল তৃষা রুচির মানুষ, তৃষা ভাল কাজের প্রশংসা করে। সব মিথ্যা। ভদ্রলোক বউকে খুবই ভালবাসেন বোঝা যাচ্ছে, তাই বউয়ের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছেন। যাক্ গে, বাড়িটা শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। গেটের সামনে সুরকি দিয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। যদুদা মানে বাড়ির চাকর জলখাবার দিয়ে গেল। আর হয়তো পনের কুড়ি দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাড়িটা দেখলে রাজার বুকের ভেতরটা কেমন একটা ব্যথায় ভরে যায়। এক একটা বাড়ি যেন তার এক একটা সন্তানের মত। নিজে হাতে হাতে ও মিস্ত্রিদের ইঁট জুগিয়ে দেয়। কোন রঙের সাথে কোন রঙ মিশিয়ে কোন ঘরে কেমন ভাবে দিলে ঘরের শোভা বাড়বে সব ও নিজের মাথা থেকে বার করে। অন্য কোন বাড়ীতে কাজ করতে গেলে সেই বাড়ির সকলের সাথে রাজার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজার যেহেতু মেয়ে ঘটিত দুর্বলতা নেই, বাড়ির মেয়েরাও কেউ রাজার বোন, কেউ বা বৌদি হয়ে যায়। রাজা নিঃসংকোচে তাদের বাড়িতে যায়। আড্ডা মারে। ছেলেরাও তাকে পছন্দ করে। কিন্তু এই বাড়িটা রাজা মনের মত করে তৈরি করেছে। অলকেশের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কথাবার্তাও হয়। কিন্তু তৃষা তার সাথে কথা প্রায় বলে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে রাজার মনে একটা অকারণ দুঃখ হয়। সে দিন রাজার খেতে ইচ্ছে করছিল না। হয়তো মনটা ভাল লাগছিল না। খাবার যেমন দিয়ে গিয়েছিল তেমনি পড়েছিল। রাজা আপনমনে, মিস্ত্রিদের তদারক করছিল। হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই রাজার বুকের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল, একেই কি অনুরণন বলে।

খাবারটা খেয়ে নিন। তৃষার কণ্ঠ স্বরে যেন জলতরঙ্গের সুর।

রাজা চমকে তাকাল। ঠিক তার পিছনে তৃষা। স্নান হয়ে গেছে। বোধহয় শ্যাম্পু করেছে। চুলগুলো খোলা, অল্প একটু সিঁদুর সিঁথিতে দেওয়া। একটা মেঘ রঙের শাড়ী পরে শ্যামলা মেয়ে তৃষা যেন অপরূপা। ওর চোখের মধ্যে কোন বেদনা নেই। পরিবর্তে ভালবাসা আর মায়াময় কৌতুক চোখে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।

না, আজ খাব না, খেতে ভাল লাগছে না, তাছাড়া এইসব ভাল ভাল খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াতে হবে তো, কিছুদিন পর থেকে অবজ্ঞার খাবার হলেও কেউতো পাঠাবে না।

অবজ্ঞার খাবার!!

নয়? এক চাকরের হাত দিয়ে আর এক চাকরকে খাবার পাঠানো কি অবজ্ঞা নয়? বুঝলেন

ম্যাডাম, এই চাকরটা টাকার জন্য কাজ করে ঠিকই কথা কিন্তু অবজ্ঞা , উপেক্ষা দয়া চায় না।

রাজর্ষি বাবু!!

আমাকে সবাই রাজা বলে ডাকে, আপনিও ইচ্ছা করলে রাজা বলে ডাকতে পারেন। অবশ্য আপনাদের মত রাজারানীদের বাড়িতে রাজা নামটাই একটা উপহাসের ব্যাপার, তাই নয়?

এত কথা সাধারণত রাজা কোন মেয়েকে বলে না। কিন্তু গত তিনমাস ধরে অবহেলিত হতে হতে ও আজ একট সুযোগ পেয়ে ক্ষোভ দমন করতে পারে না। তৃষা হঠাৎই একটা অসহায় স্নেহ কাঙাল বালককে রাজার মধ্যে দেখতে পায়। কোয়েল যেমন অভিমান করে, অনেক সময় বলে মা তোমার সাথে কথা বলব না, রাজা ও যেন তেমন একটা অভিমানাহত শিশু। তৃষার স্বামীর আবেগের বালাই নেই। হয়তো ওর স্বামী অন্য দিকে এতই আবেগাপ্লুত, তৃষাকে লক্ষ্য করার সময়ই তার নেই।

রাজা! তৃষার হৃদয়ের গভীর থেকে যেন আওয়াজটা উঠে আসে।

রাজা চমকে তাকায়।

খেয়ে নাও, তৃষার কণ্ঠে একই সঙ্গে মা, বৌদি হয়তো বা খুবই কাছের জনের কণ্ঠ যেন রাজা শুনল।

কেন খাব? একদিনও কি বাড়িটা দেখতে এসেছেন? দেখতে এসেছেন কত যত্ন করে আমি আস্তে আস্তে বাড়িটা মনের মত সাজিয়ে তুলেছি।

কে বলল, আমি দেখিনি? তৃষা খিল খিল করে হেসে উত্তর দেয়। তারপর একটু নীচু স্বরে বলে, আমি ঘরের জানলা দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করি। রাতে যখন তোমরা কাজ করে চলে যাও তখন আমি ঘরের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি খাঁজ লক্ষ্য করি।

সত্যি, আপনার ভাল লেগেছে? রাজার কণ্ঠে বাগুতার সুর।

রাজা, আমার কল্পনায় যা ছিল, আমার অনুভূতিতে যা ছিল, তা সঠিক ভাবে কি করে তুমি উপলব্ধি করলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

রাজার যেন মনে হয় স্বপ্ন দেখছে, কানে যা শুনছে মনে হয় কথা নয়, যেন সুরের মূর্ছনা।

তৃষা বৌদি!

তৃষা বৌদি নয়। তৃষা বল। তুমি আমি আজ থেকে বন্ধু। বন্ধু শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে হয়। সমবেদনা, সমঅনুভূতি, সমউত্তপ্ততা দিয়ে হয়। কোন সম্পর্কের টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে আমি বন্ধুত্ব করতে চাই না। আমি তৃষা, তুমি রাজা, দুজন দুটি সম্পূর্ণ মানুষ, আজ বন্ধু হলাম।

কিন্তু তৃষা, আপনি তো রহস্যময়ী থাকতে ভালবাসেন। একটা ব্যবধানের পর্দা এতদিন রেখে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। আজ হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেওয়ার কারণ বুঝে উঠতে পারছি না।

রাজার কথা শুনে তৃষা খিল খিল করে হেসে ওঠে। যেন ঝর্ণাধারা ওর হাসি, শ্যামলা মেয়ের শুভ্র দাঁতের হাসি রাজাকে মুগ্ধ করে।

রাজা , তোমার অনেক অভিমান না? কিন্তু শোন, যে সন্তান সাতমাসে জন্মায় অনেক মা ভয় পায় ঠিক মত বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি না? তারপর ধরো ঠাকুমা কি দিদিমা যখন সেই

শিশুকে বড়ো করে দেয় তখন মা ভাবে আর ভয় নেই। এই শিশু এখন নিরাপদ। রাজা, তুমি সেই সাতমায়ের শিশুকে আজ বিশাল প্রাসাদ করে দিয়েছ। আমি দূর থেকে দেখেছি কি করে সে বড় হচ্ছে। কি যত্ন, কি ভালবাসা দিয়ে রোদ জল উপেক্ষা করে তুমি তাকে তৈরি করছ আমার জন্য, আমার কোয়েলের জন্য।

অলকেশ বাবুর জন্য নয় কেন? রাজা হঠাৎ প্রশ্নটা করে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে তৃষার সাময়িক উচ্ছলতা চলে যায়। কেমন যেন বেদনাতুর হয়ে যায় সেই প্রথমদিনের মত।

না মানে, আপনার আপত্তি থাকলে বলতে হবে না। রাজা কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে।

তৃষা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। এখন তুমি কাজ কর। আমি যাই। তৃষা ও দিকের ঘরে চলে গেল।

সেদিনটা রাজার ভয়ানক অসহ্য কাটল। প্রতিটি মুহূর্ত কেমন যেন অসহনীয়। কিন্তু সারাদিন আর তৃষা ঘর থেকে বেরোল না। ছটার পরে বাড়ি ফিরে স্নান টান করেও রাজার ভাল লাগল না।

একবার তৃষার ক্ষণিকের জন্য হলেও দেখা উচ্ছল মুখ, আর একবার বেদনাতুর চোখ ওকে বারেকের জন্য শান্তি দিল না, কখন রাত শেষ হবে, পরের দিন সকাল হবে, এই ব্যাকুলতায় সারা রাত জেগে কেটে গেল। তবে সকাল হলেও শান্তি পাবে এ নিশ্চয়তা নেই। আজও যে তৃষা আসবে, কথা বলবে সে কে বলতে পারে। একটা কাজ করতে পারে যদি আজও রাজা না খায়। তাহলে নিশ্চয় তৃষা আসবে, খাওনি কেন অনুযোগ হয়তো করবে কিংবা করবে না? যদি তৃষা আসে রাজা আনন্দে মরে যাবে। কিন্তু যদি না আসে, তাহলে রাজা মনের দিক থেকে একেবারেই ভেঙে পড়বে। রাজা নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না কেন তার এরকম হচ্ছে। তৃষা তো তার সঙ্গে এত দিন কোন কথাই বলেনি। হয়তো তাকে মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখতে পেয়েছে। দেখেছে তার স্বল্প বিধুর চোখ। কখনও বেদনা বিধুর আঁখি। তৃষা পরের বউ। কোয়েলের মা। অলকেশের সুখী স্ত্রী, কিন্তু সত্যিই কি সুখী? অলকেশের নাম শুনলেই তৃষা কেমন যেনন চুপ করে যায়। কেন? অলকেশের মত সুপুরুষ ধনী স্বামী, তৃষা তো অলকেশের তুলনায় কিছুই নয়। তবুও তৃষা অসুখী। কেন? রাজার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় লাগে। একবার ভাবল আজ আর যাবে না। মিস্ত্রিদের বাড়ীতে গিয়ে কেমন করে কাজ করতে হবে নির্দেশ দিয়ে চলে আসবে। কিন্তু যাব কি যাব না করতে করতে রাজা পায়ে পায়ে তৃষার বাড়িতে চলে এসেছে। বাড়িটার কাছে এলে রাজা যেন কি রকম অভিভূত হয়ে যায়। এই বাড়িটা তার নিজস্ব পরিকল্পনায় তৈরি। আর এই বাড়ীতেই তৃষা থাকবে, থাকবে কোয়েল।

গেটের কাছে মিস্ত্রিরা তখনও নুড়ি পাথর ফেলে লাল লাল ইঁট দিয়ে বাঁকা করে বসিয়ে বসিয়ে পথ তৈরি করছে। তৃষা বারান্দায় একমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। অলকেশ যথারীতি বেরিয়ে গেছে। অলকেশ কখন ফেরে, কখন যায় রাজা কিছুই বুঝতে পারে না। রাজা গেট খুলে বারান্দায় উঠে এল। তৃষা তার বড় বড় চোখ তুলে রাজার দিকে তাকাল। যেন ঐ চোখে অনুযোগ কেন এত দেরি?

কিন্তু তৃষা কোন প্রশ্নই করল না। রাজা নিজেই বলল, শরীরটা ভাল ছিল না। তাই দেরী হয়ে গেল।

কেন কি হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি?

না, না, তেমন কিছু নয়, এখন ঠিক আছি।

না; না, ঠিক নেই। আজ আর রোদে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে না। ঘরে বসে দেখাশুনা কর। অলকেশ বাবু আমার ঘাড় মটকাবে।

সব কথার মাঝে অলকেশ বাবুকে ডাক কেন? তৃষা হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে।

রাজা অবাক হয়ে গেল। তৃষা সবসময় কেমন আস্তে আস্তে কথা বলে। আজ হঠাৎ রেগে উঠল কেন?

সরি, আপনাকে দুঃখ দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি।

তৃষা আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

সেই স্নেহমাখানো কৌতুকের স্বরে ফিরে বলল, রাজা, আমরা বন্ধু না? তাহলে আপনি আজ্ঞে কর কেন? তুমি তৃষা বলবে। কি নামটা তোমার পছন্দ নয়?

রাজা হঠাৎ কথা খুঁজে পায় না। তৃষাকে প্রথম দিন যখন দেখেছিল ওর চোখ দেখেই রাজার মনে হয়েছিল একেই ও খুঁজছিল এর জন্যই বোধহয় অন্য কোন মেয়েকে ওর তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করেনা। ওর চোখ দেখেই মনে হয়েছিল এ মেয়ে রাজরাজেশ্বরী হয়ে ও হেলায় সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। নিজে আধরা থেকে যে কোন ধরা ছোঁয়ার বাহিরে মানুষকে এক অদ্ভুত আকর্ষণে কাছে টেনে আনবে।

রাজার মনে হল, ও বলে, তৃষা তুমি আমার তৃষা। বহু যুগ যুগ ধরে আমি যেন তোমাকেই খুঁজছি। কিন্তু তুমি অলকেশের স্ত্রী, কোয়েলের মা হয়ে আমার কাছে এলে কেন? তুমি কেন বন্ধনহীন হয়ে এলে না? আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চলে যাওয়া যৌবনের পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ আবেগহীন মানুষকে কেন এত অভিভূত করলে? কিন্তু রাজা কিছুই বলল না। কিছু বলতে পারল না। পরিবর্তে বলল বেশ, তৃষা তোমার আপত্তি না থাকলে তুমিই বলব।

তৃষা খুব স্বাভাবিক ভাবে রাজার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল থ্যাঙ্ক ইউ. এই হচ্ছে ওড বয় এর মত কথা।

তৃষা খুব স্বাভাবিক ভাবে মাথায় হাত দিয়েছে। হয়তো বড় দিদির মত, হয়তো বা বৌদির মত। কিন্তু রাজার শরীরে আবার সেই শিহরণ খেলে গেল। কি এক অনিবর্চনীয় সুখে রাজার কেমন যেন দিশাহারা লাগল। কি বলছে নিজেই খেয়াল করল না।

তৃষা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তৃষার উত্তরের অপেক্ষা না করে রাজা বলতে থাকে তোমার খুব দুঃখ না তৃষা, অলকেশ বাবুর নাম শুনলে তুমি রেগে যাও কেন? কখনও কখনও একেবারে চুপ করে থাক? কেন? তিনি কি তোমায় ভালবাসেন না?

হঠাৎ, হাঁ হঠাৎ তৃষা রেগে গেল। রাজর্ষিবাবু আপনি হঠাৎই বেশী পরের ফ্যামিলির ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন। আমার স্বামী আপনাকে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনার উচিত কাজটা যথাযথ করে দেওয়া। তাঁর সাথে আমার কি সম্পর্ক সেটা জানাতে আমি বাধ্য নই।

আপনারও জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই। যাক্ আপনি আপনার কাজ করুন। তৃষা আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল।

রাজার এই মুহূর্তে সব বিস্বাদ লাগল। কেন অধিকারের সীমা ছাড়াতে গেল, সত্যিই তো তৃষার সাথে অলকেশের সম্পর্ক ভাল বা খারাপ হলে তার কি যায় আসে? তৃষা তো তার কেউ নয়। তৃষা তো তার সঙ্গে কথা বলেছে দুদিন মাত্র। কিন্তু ওর ওই চোখ। সেই চোখই তো ওকে পাগল করেছে। অভিভূত করেছে ঐ চোখের কত ভাষা, কখনও ভালবাসা, কখনও বেদনা, না আর ভাববে না। রাজা আর তৃষার কথা ভাববে না।

রাজাকে অপমান করে এসে তৃষার বুকটা ব্যথায় চুরমার হয়ে যায়, ছেলেটা কি তাকে পাগল ভাববে? কেন ওকে অপমান করলাম? অলকেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি সেটা জানতে চাওয়া খুব বড় অপরাধ? রাজা তো আমাকে ভালবাসে। আমিই কি বাসি না? সব কথা কি মুখে বলে জানাতে হবে? মুখের কথার আগে চোখের ভাষা যে পড়তে জানে সেই বলে দেবে অপর জনের চোখ কি বলছে? রাজার চোখ যখন বাড়িটা তৈরী করতে করতে তৃষাকে খুঁজে বেড়াত তখন তৃষাও কি জানলা দিয়ে দেখত না রাজা তাকেই খুঁজছে কিনা? কখনও কখনও রাজার চোখে পড়ে গেলে তৃষার মনেও কি অনুরণন হতো না? কিন্তু তৃষা কি করে বলবে রাজা, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার বৌদিকে, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনদের কটূক্তি আর মায়ের পীড়াপীড়িতে অলকেশ অত্যন্ত গরীব ঘরের শ্যামলা মেয়ে তৃষাকে বিয়ে করে এনেছিল। তৃষার অনেক আশা, উচ্চ আকাঙ্খা ছিল। ইচ্ছে ছিল অনেক পড়াশুনা শেখার। ছোটবেলা থেকে শরৎ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পড়ে ওর মনটা অনেক অনেক বেশি উদার। বিয়ের পর এসে ভবানীপুরের বাড়িতে তৃষা তাই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। ভেবেছিল উদার মন দিয়ে ভালবাসার গভীরতা দিয়ে সকলকে আপন করে নেবে। প্রথম প্রথম ভেবেছিল এমন তো কতই উপন্যাসে হয়। মনে মনে ছোঁয়াছুঁয়ি। এমন তো কতই দেওর, বৌদির মধ্যে হয়। তারপর বিয়ের পর সেই মানুষই পাল্টে যায়। কিন্তু না অলকেশ পাল্টায় নি। অলকেশের দাদা সমরেশ বেশির ভাগ সময় কলকাতায় বাইরে জাহাজে জাহাজে থাকে। সেই জন্য হয়তো শর্মিষ্ঠার অর্থাৎ বৌদির সাথে অলকেশের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার শিকড় এত দূর চলে গেছে অলকেশ আর ফিরতে পারে নি। কিন্তু অলকেশ কেন তাকে বিয়ে করল। গরীব পরিবারে একমুঠো ফ্যানভাত খেয়ে থাকাও অনেক সম্মানের ছিল। দিনের পর দিন হাজার চেষ্টা করে ও তৃষা অলকেশকে তার দিকে ফেরাতে পারে নি।

কি এক অমোঘ আকর্ষণে অলকেশ রাত হলে শর্মিষ্ঠার ঘরে চলে যেত। চাকর বাকর মুখ টিপে হাসত। সবাই যেন করুণার দৃষ্টিতে দেখত তৃষাকে। তৃষা এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিকও করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি এক অসীম পরিহাস, শর্মিষ্ঠার একদিনের খারাপ ব্যবহারে মর্মাহত অলকেশ তৃষার কাছে ফিরে এল। কিন্তু সে আর কয়েকদিন, তখনই কোয়েল এল। তৃষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বোধহয় ও এল। কারণ অলকেশ আবার তখন শর্মিষ্ঠার হয়ে গেছে। আবার সেই অমানবিক মানসিক অত্যাচার। তৃষার শিল্পীসত্তা, তৃষার কাব্যিক মন প্রতিবাদ করতে চায়। বাড়ী থেকে বার হয়ে পড়তে চায় কোয়েলের হাত ধরে। কিন্তু

তৃষার বাপেরবাড়ির অবস্থা ভাল নয়। তৃষার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। কোথায় যাবে। কোয়েল দেখে মা কাঁদে। প্রতিবাদ করতে গেলে অলকেশ তৃষার গায়েও হাত দেয়। ছোট্ট কোয়েল ভয়ে বালিশে মুখ লুকোয়। অলকেশ আবার উন্মত্তের মত শর্মিষ্ঠার কাছে চলে যায়। এই সময় বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনটা দেখে তৃষাই বলে, তোমার তো টাকার অভাব নেই, ঐ চালা বাড়িটা আমার কোয়েলকে কিনে দাও। আমি কোয়েলকে নিয়ে ওখানেই থাকব। এ বাড়িতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাকে তো তুমি স্ত্রীর মর্যাদা দাও না। কিন্তু কোয়েল তো তোমার সন্তান। রোজ এই ঘটনা দেখতে দেখতে ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়বে। ওর কথা ভেবে এটুকু কর। অলকেশ কথাটা লুফে নিয়েছিল। তারপর এই চালাবাড়ী, তারপর এই বিশাল বাড়ি, কিন্তু রাজাকে কি করে বলবে একথা? কি করে এত বড় অপমানের কথা এতবড় লাঞ্ছনার কথা একজন সদ্য চেনা পুরুষকে কি করে বলবে, বিশেষ করে সে তো বলেনি কোনদিন যে সে তৃষাকে ভালবাসে। হঠাৎ কোয়েলকে বুকের কাছে টেনে এনে হু হু করে কেঁদে ওঠে সে। অবোধ কোয়েল বুঝতে পারে না মা কেন কাঁদছে, সে অবাক হয়ে তৃষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে, রাজা আর আসেনি। অবশ্য কাজও বিশেষ কিছু আর নেই। কিন্তু তৃষার সঙ্গে রাজার যে একটা মানের সম্পর্ক হয়ে গেছে সেটা কি রাজা বুঝতে পারে না? তৃষার চোখ দেখে রাজা তৃষার বেদনা আছে বুঝতে পেরেছিল। অথচ তৃষার আপাত নিষ্ঠুর ব্যবহারটাই রাজা মনে রেখে দিল? তৃষার মনটা একটা অকারণ ব্যথায় ভরে ওঠে। নিজের মধ্যে ছটফট করে। একবার ভাবে রাজার বাড়ি যায়। তারপর আবার নিজেকে স্বাভাবিক সংকোচে গুটিয়ে রাখে। কয়েকটা দিন অস্থিরতার মধ্যে কাটে। স্বাভাবিক নিয়মে তৃষা স্নান খাওয়া করছে। মনটা পড়ে আছে রাজার জন্য। অলকেশের আসা যাওয়ার ঠিক নেই। তৃষার কেমন যেন ছন্নছাড়া লাগে। ভেবেছিল কোয়েলকে আঁকড়ে ধরে ওখানে কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু রাজাই ওর মনে এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। মনটা সব সময় অস্থির। গেট খোলার আওয়াজেই মনে হয় ঐ বুঝি রাজা এল। না তৃষার আশা করাটাই বৃথা। ইতিমধ্যে বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন কলিং বেলের আওয়াজে তৃষা দরজা খুলে দেখে রাজা দাঁড়িয়ে। রাজা তৃষার দিকে অপলক তাকিয়ে। তৃষা এতদিন বোঝেনি। আজ তৃষা সেই অনুরণন অনুভব করল। কিছুক্ষণ দুজনে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর তৃষাই তার রিনরিন কণ্ঠে বলে উঠল রাজা, এস এস, এতদিন আসনি কেন?

রাজা এইরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করেনি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, অলকেশবাবুকে এই চেক্ বইটা ফেরত দিতে এসেছি। তৃষা চেক্ বই নেবার কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, চলত ঘরে, একটু চা খাবে চল।

রাজা মুখে মৃদু আপত্তি করলেও পায়ে পায়ে তৃষার সঙ্গে ঘরে এসে বসল। তৃষা নিজের হাতে চা করে এনে রাজার হাতে দিয়ে বলল, রাজা, তুমি এতদিন আসনি কেন? আমি জানি আমি অন্যায় করেছি, তোমাকে আঘাত করেছি। আমি দুঃখী, আমি তোমায় কোনদিনই বলিনি। কিন্তু তবুও তুমি কি ভাবে যেন জানতে। আচ্ছা তুমিই বল যার স্বামী তার বৌদির সাথে রাত কাটায় সে কি নিজের মুখে এই লজ্জার কথা বলতে পারে? আগে তুমি এ কথা জানতে না,

আজ জানার পরেও কি তুমি এবারের মত আমায় ক্ষমা করতে পারনা? তৃষার চোখে জল টলটল করে। রাজার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

তৃষা! রাজা তৃষার চিবুকটা ধরে ডাকে। তুমি কি আমার মনের কথা বোঝনি? দিকভ্রষ্ট, উদভ্রান্ত আমার মনের জাহাজ তোমার চোখ দেখে মনে মনে কবেই তো তোমার কাছে নোঙর ফেলেছি। ক্ষমা, ঘৃণা এইসব শব্দের এখানে কোন অস্তিত্ব নেই।

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুসুম চয়নে। সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে।

তৃষা রাজার কণ্ঠে গান শুনে কি এক অনির্বচনীয় পুলকে শিহরিত হল। রাজা ঠিক তার মনের মত মানুষ। ছোটবেলা থেকে গান কবিতা তৃষার প্রাণ। মনে মনে ভাবত ধনী স্বামী সে চায় না। এমন একজন মানুষ তার জীবনে আসুক যে তাকে মন দিয়ে বুঝবে, ওর মনের কথা তার মনের কথা এক হয়ে যাবে। তার পরিবর্তে সে অলকেশকে পেল। মনের কথা দূরে থাক, অলকেশ তার সাথে কথাই বলে না। আর আজ সেই মনের মানুষ তার মনের দরজায় কড়া নাড়ছে, অথচ ও তাকে বুঝতে পারে নি। তৃষার এক মুহূর্তে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সব চলে গেল। চোখ মুছে তৃষা রাজার চোখে চোখ রেখে আবৃত্তি করে উঠল।

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে ঊষার আভাস।।

সাক্ষাৎকার

প্রসঙ্গ-আন্তর্জাতিক পঞ্চম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ও বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প

আলাপচারিতায় পরিচালক গৌতম ঘোষ এবং 'অ'

অ ঃ পশ্চিমবঙ্গে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয় সেটা করার উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল বলে আপনি মনে করেন?

গৌতম ঘোষ ঃ দেখুন, এটা বলতে গেলে আমাদের একটু পিছন দিকের ইতিহাসটা জানতে হবে, বিশ্বে চলচ্চিত্র উৎসবের ভাবনাটা প্রথম শুরু হয় 'ভেনিসে' সেই মুসোলিনির সময় প্রায় তিরিশ দশকে। আমেরিকা এবং ইউরোপে কিছু সমালোচক এবং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত এমন মানুষেরাই এই ধরনের ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। কারণ তারা বুঝেছিলেন চলচ্চিত্র একটা নিছক প্রমোদ মাধ্যম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিনেমার যে সমস্ত বিবর্তন হচ্ছে তা যদি কোনোভাবে একত্রিত করে উৎসবের আকারে দেখা যায় তাহলে তা সিনেমার ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, শুধু তাই নয় চলচ্চিত্র শিল্প নতুন মাত্রা যোগ করে এগিয়ে যাবে। এইভাবেই চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসব শুরু হয় অনেক পরে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হয় ১৯৫২ সালে। যেটা আমার মনে হয় আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পে 'নবতরঙ্গের' সৃষ্টি করে ছিল। এই উৎসবে বেশ কিছু ইউরোপিয়ান ছবি বিশেষ করে ইটালিয়ান ছবি, আমেরিকান ছবি, জাপানি ছবি দেখানো হয়েছিল। ঐ সময় তৎকালীন নতুন প্রজন্মের কিছু লোকজন এই সব ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ভেবে ছিলেন যে আমাদের দেশেও এই ধরনের অন্য ধারার ছবি করা সম্ভব। এদের মধ্যে আছেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিন্হা প্রভৃতি। যদিও এঁরা তখনও কেউই পরিচালক হননি, কিন্তু এই চলচ্চিত্র উৎসব থেকেই এঁরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সেই অর্থেই আমি মনে করি বাহান্নর চলচ্চিত্র উৎসব নতুন ধারার সিনেমা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছিল এর অনেক পরে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল চলচ্চিত্র উৎসব একবছর রাজধানী দিল্লিতে হবে আর পরের বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল দু'বার, প্রথমবার ১৯৮২ সালে এবং পরে ১৯৯১ সালে। দুবারই আমরা দেখতে পাই মানুষ প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি দেখছেন। ১৯৮২ সালে মূলতঃ গাঁদারের ছবি দেখানো হয়েছিল। এঁর ছবি একটু দুরূহ হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ সোসাইটি সিনেমা হলে সারারাত্রি লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখেছিলেন। ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় আমাদের যে সমস্ত ছবি দেখানো হয়েছিল সেখানেও দর্শক প্রবল উৎসাহ নিয়ে ছবি দেখেছিলেন। বিদেশি দর্শক যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন যে কলকাতায় চলচ্চিত্রামোদী দর্শক অনেক বেশী ভারতবর্ষের অন্য শহরগুলো থেকে। সেই কারণেই মাইকেলএাঞ্জেলো এ্যান্টোনিয়নি এবং অন্যান্যরাও এটা লক্ষ্য করে কলকাতায় ছবি পাঠাতে উৎসাহী হয়েছিলেন। যেহেতু তখন বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হতো সেই হেতু কলকাতায় এত উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র

উৎসব করা সম্ভব ছিল না। লক্ষ্য করা গেছে কলকাতা এবং ত্রিবান্দ্রামে দর্শকদের মধ্যে এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ আছে। দিল্লি ও মুম্বাইতেও চলচ্চিত্রামোদী দর্শক আছেন তবে তাঁরা সংখ্যায় অল্প। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, কলকাতায় যে হারে চলচ্চিত্র উৎসবের টিকিট বিক্রি হয় তা আর অন্য কোথাও হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার এবং দর্শকদের চাহিদা দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক করলেন যে, দিল্লির অনুমতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবছর চলচ্চিত্র উৎসব করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের দেখাদেখি অন্যান্য রাজ্যগুলোও চলচ্চিত্র উৎসব করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দিকের দুই বছর এই চলচ্চিত্র উৎসব আন্তর্জাতিক চেহারা পায় নি, তবে গত বছর থেকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব একটি আন্তর্জাতিক চেহারা নেয়। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবি আমরা দেখাবার সুযোগ পাই। যেমন, ইউরোপীয়ান ছবি, আমেরিকান ছবি, লাতিন আমেরিকার ছবি। আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধবও নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এখানে আসেন এবং তাঁদের ছবি পাঠান। যেমন, গত বছর জানুসি এসেছিলেন এবং অন্য আরও বিদেশি পরিচালকরা এসেছিলেন এভাবেই এটা একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে বিভিন্ন করপোরেট হাউসগুলো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের যে ফিয়াপ (FIAP) বলে এ্যাপেকস বডি আছে তারাও এই চলচ্চিত্র উৎসবকে স্বীকৃতি দেন ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযোজকরা এখানে ছবি পাঠাতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সুতরাং আমরা এটা বলতেই পারি যে আমাদের এই উৎসবের ক্ষেত্রে ক্রমশই আমরা সাফল্য পেতে চলেছি।

অ ঃ আচ্ছা গৌতমদা, কলকাতায় যে চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে তাঁতে বাংলার চলচ্চিত্র কতটা উপকৃত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

গৌতম ঘোষ ঃ আমি তো আগেই বলেছি, ১৯৫২ সালে চলচ্চিত্র উৎসব আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। ফলে আমরা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, রাজেন তরফদারদের মত পরিচালকদের পেয়েছি। তার পরবর্তী প্রজন্মে তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী এঁরাও বাঙালী দর্শকের ভাল লাগা নিয়ে ভাল ছবি করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের পরের প্রজন্মে আমরা। যদিও আমাদের সুযোগের ক্ষেত্রটা ওনাদের থেকে অনেক বেশী হয়ে গেছে কারণ আমরা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু এ সব সত্বেও একটা কথা ঠিকই এখন বাংলা ছবির মান অনেক নিম্নগামী। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হিন্দি ও মাদ্রাজি ছবির অনুকরণ, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, বাংলাদেশি গল্পকে চিট করে কাস্ত করা প্রভৃতির জন্যে পশ্চিমঙ্গের বাংলা ছবির মান উন্নত তো হয়ইনি বরং এর রুচিরও মান নিম্নগামী হয়েছে। ফলে বাংলা ছবির বাজারেও কোনও উন্নতি হয়নি। এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি দেখতে মানুষের ভিড় কিন্তু বাংলা ছবি দেখতে বর্তমানে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আমার কাছে এর একটাই ব্যাখ্যা আসলে বাঙালির সর্বক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক জগতে একটা অধঃপতন হয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসব একটা হুজুগ, একটা সমারোহ, এটাকে এই হিসেবে দেখেই সবাই ছবি দেখতে যাচ্ছেন। অথচ, হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখছেন না। আমরা যদি একটু ফিরে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে

৫০,৬০,৭০ দশকে যত দর্শক হলে যেতেন তা এখন আর যাচ্ছেন না। একেই লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির টান কমে যাচ্ছে তার ওপর মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক টেলিভিশন দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আর ঘর থেকে বেরোতে চান না। ঐ মাঝে মাঝে হলে যান একটা কি দুটো ভাল ছবি এলে না হলে তারা টিভিতেই ছবি দেখেন। এর ফলে বাণিজ্যিক হলগুলিতে এই ধরনের মধ্যবিত্ত দর্শকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। যারা এখন হলে যান তারা হলেন ছাত্র এবং লুম্পেন শ্রেণীর বা তথাকথিত নব্যবাবু অর্থাৎ যাঁদের হাতে হঠাৎ পয়সা এসেছে। এদের মধ্যে কিন্তু সাংস্কৃতিক কোন বালাই নেই। আমাদের বাংলা ছবি এখন মোটামুটি এদের রুচির কথা ভেবেই তৈরি করা হচ্ছে। যেমন ধরুন কিছু বাঙালি সেন্টিমেন্ট, কিছু পুরোনো বাংলা ছবির সেন্টিমেন্ট, কিছুটা হিন্দি ছবির মতো করে গান নাচ মারামারি ইত্যাদি। যেহেতু রুচিশীল দর্শকেরা এখন বাংলা ছবি থেকে বিমুখ হয়েছেন সুতরাং তাঁদের কথা বর্তমানের বাংলা ছবির প্রযোজক বা পরিচালকদের মাথায় আর নেই। ফলে, চলচ্চিত্র উৎসবে একদিক থেকে আমরা যখন অনেক ছবি দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি আমরা বাংলা ছবির দর্শককেও হারাচ্ছি। স্বভাবতই এখন একটা প্রশ্ন জাগে যে তাহলে এখনকার চলচ্চিত্র উৎসব এখনকার বাঙালি পরিচালক, প্রযোজক এবং দর্শককে কতটা উৎসাহী করছে? হয়ত করছে না, একটা হুজুগে আমরা চলচ্চিত্র উৎসব দেখছি। কিংবা চলচ্চিত্র উৎসবের আরও একটু দায়িত্ব বোধ হয় থাকা উচিৎ। তার নিজস্ব একটা চরিত্র তৈরি করা উচিত। সেটা হচ্ছে, একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত বেশী চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে সেখানে টিকে থাকতে হলে মূলতঃ দুটো জিনিস দরকার-প্রথমত বাজার অর্থাৎ যে ফিল্ম বাইরে থেকে লোকে পাঠাচ্ছে তার প্রযোজকেরা ভাবছেন যে ভারতবর্ষে ফিল্ম পাঠালে তাদের কোন বাজার নেই, তারা পাঠাচ্ছেন এই ভেবে যে ওখানকার লোকে ফিল্ম দেখুক অর্থাৎ খানিকটা দয়া করে পাঠাচ্ছেন। শুধুমাত্র প্রচুর ছবি দেখালেই হবে না পাশাপাশি দর্শক তৈরি করার ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করতে হবে। যেমন, ছবি নিয়ে আলোচনা চক্র তৈরি করা, ছবিগুলোকে সঠিকভাবে প্রচার করা, দর্শকদের সভাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি, এগুলোর একটা সংগঠিত রূপ দেওয়া দরকার। তা না হলে বিদেশি পরিচালকদের এই উৎসবে ছবি পাঠানোর উৎসাহ কমে যাবে।

অ ঃ যে দর্শক 'বেদের মেয়ে জোৎস্না' দেখতে যাচ্ছে তারাই আবার 'পার', 'উনিশে এপ্রিল', 'অনু'তে ভিড় করছেন এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি। নাকি আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাংলার মেইনস্ট্রিমের ছবি ভালো গল্প দিতে পারছে না বলেই বাঙালী দর্শক এই ধরনের গল্প সমৃদ্ধ ছবি দেখতে যাচ্ছেন?

গৌতম ঘোষ ঃ ব্যাপার হচ্ছে বাঙালি মধ্যবিত্ত দর্শক চিরকাল ঐ বাংলা সাহিত্য থেকে গল্প নিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে। এখনও আমরা সিনেমাকে বই বলি। কোথায় যাচ্ছি? না, বই দেখতে। ফলে বইয়ের একটা গল্প বাঙালি দর্শক চান। সেই গল্প প্রথম থেকেই বাংলা ছবিতে ছিল। যদিও তা ছিল মূলত মধ্যবিত্ত জীবন বা সেন্টিমেন্ট নিয়ে। এই ধরনটাই বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়েছে। সেটা দেখতেই বাঙালি দর্শক অভ্যস্ত। তাই বাঙালি দর্শক একটা নিটোল গল্প চায়। এই কারণেই এককালে বাংলা ছবিতে ভালো গল্প, গান এবং পরিশীলিত অভিনয় দেখা যেত। এই

তিনটিই ছিল বাংলা ছবির ট্রাম্পকার্ড বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখন আর সে ধরনের গল্প নেই, এবং এই ধরনের ব্যাপার মাথায় রেখে এখন আর ছবি করাও হয় না। এখন যারা দর্শক তারা সারাক্ষণ হিন্দি সিনেমা দেখছে, ফলে তার মাথার মধ্যে সেই ধরনের প্রমোদ উপকরণ সবসময় ঘুরছে। এই ভেবেই এখন দর্শক টানতে বাংলা ছবিতে এর ছিটেফোঁটা দেবার একটা প্রচেষ্টা চলেছে যদি তাতে কিছু দর্শক টানা যায়। ষাট বা সত্তর দশকে একবার চেষ্টা হয়েছিল যে হিন্দি সিনেমার মত করে বাংলা ছবি তৈরি করা কিন্তু তা একদমই চলেনি। তবে আজকাল কিছু কিছু ছবি চলছে এই ধরনের উপাদান দিয়ে। আর আপনি যে বললেন 'বেদের মেয়ে জোৎস্না' ছবিটার কথা আমার কিন্তু মনে হয় ছবিটির বিষয়বস্তু অসম্ভব ভালো। এটা একটা বহু পুরোনো যাত্রা। যাত্রা হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রংপুরের দিকে এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে সাফল্য পেয়েছে। এটা একটা দেশজ উপাদান সমৃদ্ধ লোকগল্প। যদিও ছবিটা তৈরি হয়েছে বস্তা পচা বাঁধা গতে। তা সত্ত্বেও মানুষ এটাকে গ্রহণ করেছে এই কারণে যে বহুদিন ধরে এই ধরণের দেশজ গল্প যাত্রার মাধ্যমে, লোকগাথার মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সুতরাং এই উপাদানগুলো মানুষ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাই এই ছবিটির সাফল্য শুধুমাত্র কলকাতায় নয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে সার্বিক ভাবে আর্থিক সাফল্য পেয়েছে। এবারের উৎসবে আপনারা তারাগনাভের ছবি দেখে থাকবেন, ইনি একজন জর্জিয়ান পরিচালক। ইনি চেষ্টা করেছিলেন এইরকম লোকগাথা নিয়ে অতীব সুন্দর শিল্প সুষমায় সজ্জিত ছবি তৈরি করতে। এই ছবির গল্প পুরোপুরি দেশজ। কিন্তু তিনি তার উপস্থাপনায় দেশজ উপাদানের সঙ্গে আধুনিক শিল্প সুষমাকে মিশিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। যেটা আমরা এখনও করতে পারিনি। আমাদের দেশে ময়মনসিংহ গীতিকাব্য নিয়েও অসাধারণ ছবি হতে পারত। কিন্তু আমরা এই মধ্যবিত্ত সাহিত্যের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারিনি। আমরা নিম্নবর্গ মানুষের চেতনা, স্বপ্ন, ভালোলাগা নিয়ে ভাবিনি, সব কিছুই করেছি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে। যখন কাউকে জোর করে চাষী সাজাই তখন আমাদের মতন করে ভাবি, জোর করে কাউকে জেলে সাজাই আমাদের মত করে ভাবি। কখনই তাদের মতো করে ভাবিনা। ফলে আমাদের মানসিকতায় যে সিনেমা বড় হয়েছে তাকে সমাজে সাধারণ মানুষরা গ্রহণ করবে এটা অবিশ্বাস্য। আপনি যে 'পার', '১৯শে এপ্রিল' 'অনু' প্রভৃতি ছবির কথা বললেন সেগুলি কলকাতার কিছু হলে চলেছে কিন্তু তাতে অর্ধেক টাকাও ওঠেনি। এই ছবিগুলো বাণিজ্যিকভাবে সফল নয়। 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবিটি এগারো সপ্তাহ ধরে কলকাতার বাংলা ছবির হলগুলোতে চালানো হয়েছিল তাতে প্রোডিউসারের ঘরে গিয়েছিল মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। আর এখন হয়তো ১৪ বা ১৫ সপ্তাহ চালিয়ে ঘরে উঠবে দু লক্ষ কি আড়াই লক্ষ টাকা। মানে একটা ছবির যা খরচ তার ১০ শতাংশও ওঠে না। সুতরাং বাণিজ্যিক দিক থেকে আমরা একেবারেই সফল নই। যে মধ্যবিত্ত দর্শক সাধারণত টিভি থেকে উঠতে চায় না তারা যখন কানা-ঘুষো শোনে, এই ছবিতে একটা ভাল গল্প আছে, পরিবার পরিজন নিয়ে দেখা যাবে কারণ কোন বেলেল্লাপনা নেই, তাহলে চল একটু হলে যাই। বাণিজ্যিক ভাবে সাফল্য পেতে গেলে আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে গ্রামের হলগুলো আছে সেখানে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে, শুধু কলকাতার ওপর ভরসা করলে হবে না।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিনহা এদের ছবি কি করে সফল হয়েছিল? এদের সব ছবিতেই কিন্তু টাকা ওঠেনি। বহু ছবি মার খেয়েছে, তবে এইসব পরিচালকদের ছবি বিদেশে একটা বাজার তৈরি করতে পেরেছিল, যার সুযোগ পরবর্তী কালে আমরা পাচ্ছি। এখন ধরুন একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে যে, একটা ছবি তৈরি করতে কত টাকা লাগবে? আমি বললাম তিরিশ লক্ষ টাকা লাগবে। স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন এতটাকা বিনিয়োগ করলে ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা আশা রাখা যেতে পারে? তখন আমি তাকে বললাম বিদেশের বাজারে আমি পনের লক্ষ টাকা ব্যবসা করতে পারব। তখন তিনি ভাবতে পারবেন পনের লক্ষ টাকা যদি বিদেশ থেকে পাই তাহলে বাকি টাকাটা ভারতবর্ষের বাজার থেকে পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে ভেবে লগ্নী করতে উৎসাহ বোধ করতে পারেন। যদিও আমরা এখনও সাধারণ মানুষ বা নিম্নবর্গের মানুষদের কথা ভেবে তাদের দেশজ ভাবনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপাদান-এর কথা ভেবে ছবি তৈরি করতে পারিনি। হয়ত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাজ হয়ে চলেছে। তাই আজকে আমাদের ছবি তৈরি করতে গিয়ে ভাবতে হবে যে খালি কলকাতার মানুষদের কথা ভেবে ছবি তৈরি করব না আরও সাধারণ নিম্নবর্গ মানুষের কথা ভেবে ছবি তৈরি করে জেলার মধ্যে প্রবেশ করব। যদিও একদল লোক বলেন এই ধরনের ছবি করতে গেলে তথাকথিত ঐ ফরমুলা সেন্টিমেন্ট না দিলে ওখানকার মানুষ গ্রহণ করবে না তা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ জেলার মানুষ যে কলকাতার মানুষের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে এটা একটা সম্পূর্ণ অমূলক ধারনা। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আপনি যদি 'দেশ' পত্রিকা পড়েন তাহলে দেখবেন যে সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত চিঠি আসে সেগুলো সবই প্রায় জেলা থেকে। কলকাতা থেকে আজকাল কিছুই আসে না প্রায়। কলকাতা বেশ কূপমন্ডুক হয়ে গেছে। যারা কলকাতায় থাকেন বলে মনে করছেন যে আমরা খুব বোদ্ধা, তারা হয়ত ভুলই করছেন।

অ ঃ এই যে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পরে ব্যাপারটা এরকম হবে না তো যে চলচ্চিত্র উৎসবের মূল উদ্দেশ্য দূরে থেকে গেল আর বিজ্ঞাপনের সমারোহে ব্যাপারটা পুরোপুরি বাণিজ্যিক হয়ে গেল?

গৌতম ঘোষ ঃ চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রে এখনো সেরকম হয়নি। বিজ্ঞাপন দাতারা দুতিন বছর ধরে টাকা দিচ্ছেন কিন্তু তারা কখনই বলেননি যে তাদের বিপুলভাবে প্রচার করতে হবে। অবশ্য যদি ভবিষ্যতে তারা বিপুলভাবে টাকা দেন তখন হয়তো সমপরিমাণ প্রচার চাইতেও পারেন। তাই তার আগেই যদি আমরা চলচ্চিত্র উৎসবের চরিত্র তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা তাদের বলতে পারব যে এটা বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র উৎসব। সুতরাং আপনারা যখন কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন, এখানে আরোও পাঁচটা ভাল কাজকে সাহায্য করেন, তেমন এই উৎসবকেও করবেন।

অ ঃ আমাদের রাজ্যে যারা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত তারা কতটা এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছে?

গৌতম ঘোষ ঃ দেখুন, এখন যারা সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা রয়েছেন, তারা সকলেই ডেলি ওয়েজেসে কাজ করেন। সুতরাং তাদের প্রবল উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও রোজ এসে

ছবি দেখা সম্ভব হয় না। এছাড়াও যেভাবে ডেলিগেট কার্ড দেওয়া হয় তার সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় চেনা পরিচিতির সুযোগে অনেক অপ্রয়োজনীয় লোকও কার্ড পেয়ে যান। তাই আমাদের ভাবতে হবে এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে টালিগঞ্জের কলাকুশলীদের জন্য ঐ অঞ্চলেই কোন বিশেষ শোয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। যাতে কলাকুশলী শিল্পীরা সহজেই দেখতে পারেন। এটা না হলে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারব না বলে আমি মনে করি।

অ ঃ আচ্ছা এই যে বললেন অপ্রয়োজনীয় লোকও কার্ড পেয়ে যায় যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়?

গৌতম ঘোষ ঃ দেখুন কিছু লোক কার্ড করায় সম্পূর্ণ শখে এবং হুজুগে। তারা ভাবেন ডেলিগেট না হলে সামাজিক সম্মান থাকবে না। তবে এদের নিয়েই সবাইকে বিচার করলে হবে না। যেমন লোকে বলে ব্যুরোক্রাটরা কার্ড পাচ্ছেন এটা তাদেরই উৎযব। আমি অনেক ব্যুরোক্রাটদের জানি যারা ছবি করলে কলকাতার সত্তরভাগ পরিচালকদের থেকে ভাল ছবি করবেন। কারণ তাদের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান রয়েছে। তবে এবার আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম ঢালাও ডেলিগেট কার্ড না দেওয়ার জন্য। কান ফেস্টিভ্যালে যেটা হয় যে ক্রিটিকরা বহু আগে থেকেই নাম নথিভুক্ত করিয়ে বিশেষ কিছু ছবির জন্য ডেলিগেট কার্ড পান সব ছবির জন্য নয়। আর যে ছবি দেখানো হচ্ছে তার কলাকুশলী এবং শিল্পীরা কিছু ডেলিগেট কার্ড পান। বাকিরা সকলে কিন্তু টিকিট কেটে ছবি দেখেন। ভেনিসেও তাই হয়। আমাদের মত ঢালাও কার্ড কোথাও দেওয়া হয় না। টিকিট কেটে ছবি দেখার পেছনে সত্যিকারে দর্শক পাওয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়। কারণ টিকিট কেটে সিনেমা দেখার পেছনে একটা ছবি দেখার তাগিদ তৈরি হয়। এমনও হতে পারে যে আমরা শিল্পী ও কলাকুশলীদের কম দামে সিজিন টিকিট দিলাম।

অ ঃ গৌতমদা আমাদের সরকারি হলগুলো ছাড়া অন্য বেসরকারি হলগুলোর অবস্থাতো খুব খারাপ।

গৌতম ঘোষ ঃ না সবগুলো নয়। বেসরকারি হলগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে প্রযুক্তিগতভাবে এখন প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করেছে। যেমন, এরা সাউন্ড সিস্টেম, এবং প্রোজেকসনে প্রভূত উন্নতি করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, গ্লোব মানে তথাকথিত সাহেব পাড়ার হলগুলো। সে তুলনায় আমাদের বাংলা হলগুলো অনেক পিছিয়ে। আমরা উৎসবের কারণে অস্থায়ী ব্যবস্থার আয়োজন করি কিছু কিছু হলে। সেখানে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নাটকের হল যেমন গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ প্রভৃতি। এখানে স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখালে নাটকের লোকেরা আপত্তি করবে এই জন্যে আমাদের সকলকে একটা মঞ্চে আসতে হবে। আমাদের বাঙালির জাতীয় চরিত্র হচ্ছে ঝগড়া করা তাই একজায়গায় আসতে সময় লাগছে, চেষ্টা চলছে। দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়।

অ ঃ সরকার নিজের চেষ্টায় তো কিছু হল তৈরি করতে পারে?

গৌতম ঘোষ ঃ সরকারের হলের পরিকল্পনা ছিল। যেমন, আনোয়ার শাহ রোডে তিনটে হল করার পরিকল্পনা ছিল। একটা বড়, একটা মাঝারি, একটা ছোট। কিন্তু নানারকম মামলা মোকদ্দমার জন্য তা আর হয়ে ওঠেনি। এছাড়া রবীন্দ্রভবনগুলিকেও হল করার পরিকল্পনা ছিল। তার কিছুটা হয়েছে, যেমন শিলিগুড়ি, বহরমপুর ও বর্ধমানের হলগুলো ভালো চলছে। কিন্তু এগুলো সবই হচ্ছে মিশ্র ব্যবস্থা অর্থাৎ থিয়েটার ও সিনেমা দুই-ই চলে। অবশ্য সরকারেরও কিছু অসুবিধে আছে। অনেক সময় ব্লাক মানি দিতে হয় যা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, যদি বড় হলের কথা না ভেবে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট হলের কথা ভাবা হয় তাহলে প্রদর্শনীর মত করে ভালো ছবি দেখার একটা উপায় হতে পারে।

অ ঃ এবার একটা নতুন জিনিস দেখছি, ফেস্টিভ্যালের কিছু ছবি বর্ধমান ও শিলিগুড়িতে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এতে কি নতুন ভাবে দর্শকের মান উন্নত হবে মনে হয়?

গৌতম ঘোষ ঃ এ প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। আমাদের উৎসবের কিছু ছবিকে বিভিন্ন জেলাগুলিতে দেখানো হোক। পুরো প্যাকেজ দেখানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় প্রযোজকরা বলে দেন যে কলকাতায় তিনটে প্রদর্শনীর পর ছবি ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে। তবুও আমরা শুরু করেছি জেলায় কিছু করে ছবি দেখাতে। পরে এই প্যাকেজ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আমি মনে করি জেলা শহরগুলিতে উত্তাপ্ত উৎসাহী দর্শক রয়েছেন এবং এই শহরগুলিতে যদি ভাল ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এখান থেকেই ভালো পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রী, কলাকুশলী পাবো । কারণ আমার মনে হয় জেলা শহরগুলিতেই এখনও কিছুটা বাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে আছে।

অ ঃ একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন করি। আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যাতে এই যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গেল তাতে এত টাকা খরচা করে উৎসব না করে সেই টাকাটা ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো যেত না?

গৌতম ঘোষ ঃ আসলে বিষয়টা নিয়ে আমরা ভেবেছি, কিন্তু ঘটনাটা হল শেষ মুহূর্তে এসে আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়ে গিয়েছিল তাই তা আর পরিবর্তন করা যায় নি। তবে আমি পন্টি কালেকে ফোন করে বলেছিলাম যে কি অবস্থার মধ্যে আমাদের উৎসব করতে হচ্ছে। তখন উনি ইতালিয়ান সরকারকে বলে একটা বড় ধরণের সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া টিকিটের পুরো টাকাটাই উড়িষ্যাতে পাঠানো হয়েছে।

অ ঃ এবার নয় টিকিট বিক্রির টাকাটা উড়িষ্যায় গেছে কিন্তু আগেরবারের টাকাটা বা অন্যবারের টাকাটায় কি করা হবে?

গৌতম ঘোষ ঃ আগেরবারের টাকাটা চিফ মিনিস্টার ফান্ডে জমা করা হয়েছিল। সাধারণতঃ টাকাটা চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড এবং সিনে ওয়ার্কার্স রিলিফ ফান্ডে ভাগ করে দেওয়া হয়।

অ ঃ বিদেশ থেকে যে অতিথিরা আসেন তাদের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক আদান প্রদান কতটা হয়?

গৌতম ঘোষ ঃ কিছু পরিচালক বা পরিচালিকা আসেন ভারতবর্ষে ফ্রি টিকিট পাওয়ার লোভে অর্থাৎ ঘুরতে আসেন। ভারতবর্ষের একটা আকর্ষণ আছে কিন্তু আসতে গেলে যে খরচা তা

অনেক সময় ব্যয়সাধ্য হয়ে ওঠে না। এটা অনেকেই আমাকে বলেছে। কিন্তু এসে একটা সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হয় যেমন কোথায় কি ধরণের ছবি তৈরি হচ্ছে সেখানকার চলচ্চিত্রকাররা কি ভাবছেন, ইরানে কেন অন্য ছবি তৈরি হচ্ছে সেখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কিরকম ইত্যাদি। ভারতবর্ষে এসে এরা অবাক হয়ে যান যে, এখানে এখনো এত মানুষ ছবি দেখেন, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় টিভির দৌলতে ছবির দর্শক কমে গেছে। আমাদের চলচ্চিত্র উৎসবে এত মানুষ ছবি দেখেন দেখে ওরা অবাক হয়ে যান। আমাকে একজন টার্কিস পরিচালক বললেন তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা থাকলে আমার প্রযোজক অনেক টাকা পেয়ে যেত। এভাবে আদান প্রদান হয়। তবে আমরা এত ছবি দেখাই তারপর আর কথা বলবার সময় থাকে না, আমার মনে হয় ছবির সংখ্যা কমিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনার জন্য সময় দেওয়া উচিত, এই আদান প্রদানের জন্য আরো সময় দেওয়া উচিত তাহলে আমরা ফেস্টিভ্যালের ফলাফলটা বুঝতে পারবো।

অ ঃ এই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে কি আমাদের বাণিজ্যিক বাংলা ছবি কোনরকম উপকৃত হওয়ার লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন?

গৌতম ঘোষ ঃ না, অদূর ভবিষ্যতেও নেই। কারণ এটার সঙ্গে একটা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর যোগাযোগ আছে। যদি আমরা সামগ্রিক ভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক অবস্থানের পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে একটা সমারোহ দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

অ ঃ সরকারে একটা রাজনৈতিক দল আছে-তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই উৎসবকে চালাচ্ছে, ধরা গেল অন্য একটি রাজনৈতিক দল সরকারের এলে তাদের কাছে এই সরকারী খরচটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলো তখন আপনারা যারা এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত তারা কি উপায়ে এই চলচ্চিত্র উৎসব সংগঠিত করতে পারবেন?

গৌতম ঘোষ ঃ না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উৎসবের কোন যোগাযোগ নেই। তবে যেহেতু এটা সরকারি অনুষ্ঠান সেহেতু বলতে পারি বর্তমান সরকার কোনরকম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কখনো এই চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। যদিও খরচের ব্যাপারে কিছু বিধি নিষেধ করেছেন, সেটা কতটা ঠিক বা বেঠিক সেটা বিচার্য বিষয়। তবে যদি সত্যিকারের কোন ফাংশান্যাল সোসাইটি করা যায় তাহলে সরকার পরিবর্তন হলেও চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। হয়তো সোসাইটির মধ্যে রাজনৈতিক দলের কাছাকাছি থাকা কোন কোন নতুন লোকজন আসবেন।

অ ঃ আমার শেষ প্রশ্ন, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে হিন্দি ছবিতে অনেক সময় অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে নাচ বা গান থাকলেও 'এ' সার্টিফিকেট পরে না। কিন্তু আর্ট বা ভাল ফিল্মের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের একটু অন্তরঙ্গ কোন দৃশ্য থাকলেই বা অন্য ধরণের কথাবার্তা থাকলে তাকে 'এ' মার্কা করে দেওয়া হচ্ছে?

গৌতম ঘোষ ঃ এটা একটা সোসাল ট্যাবু, এটা থাকা উচিত নয়। ইউরোপের অনেক দেশেই সেনসারশীপ নেই আবার আমেরিকাতে আছে। আমাদের ছবিতে যে ধরণের যৌন মিলনের দৃশ্য

দেখানো হয় তা হিন্দি ছবির অঙ্গভঙ্গির থেকে অনেক ভাল। হিন্দি ছবির বিকৃত সেক্স বা ভায়োলেন্সের চেয়ে একটি নারী পুরুষের সুস্থ যৌন মিলন দেখানো অনেক স্বাস্থ্যকর বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি ভায়োলেন্স-এর চেয়ে সেক্স অনেক ভালো, কারণ একটা নারী এবং পুরুষের যৌন মিলন পরস্পরকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে হয়। যুদ্ধ মানে একটি মানুষ আর একটি মানুষকে ধ্বংস করছে। মানুষের মনে প্রতিহিংসাকে প্রেরণা দিচ্ছে। আমাকে যদি সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমি বলবো লাগাতার সেক্স করো কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ভায়োলেন্স একদম বন্ধ করে দাও। তবে নিশ্চয়ই এর সুযোগে কেউ ব্লু ফিল্ম করলে তাকে শিল্প বলে মেনে নেওয়া যাবে না। সেটা নিশ্চয়ই খুবই খারাপ ব্যাপার হবে, কিন্তু যদি ছবির প্রয়োজনে শিল্প সম্মত ভাবে যৌন মিলনের দৃশ্য দেখানো হয় আমি অন্তত তাতে কোন অপরাধ দেখি না। এই মিড্‌লক্লাস ট্যাবু ভেঙ্গে ফেলা উচিত বলে আমি মনে করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে 'অ' এর পক্ষে তীর্থঙ্কর মিত্র

স্মরণ

বেগম সুফিয়া কামাল

তরুণ সান্যাল

দূরদর্শনে খবর শুনলাম বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজসেবিকা বেগম সুফিয়া কামাল ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমাধিপর্বেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ছিল জাতীয় শোকও। সুফিয়া কামাল বিষয়ে কলকাতাবাসী বাঙালির কিছু আবেগ থাকবার কথা। এই শহরে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি কর্পোরেশন স্কুলে পড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি গুরু মেনেছিলেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব নেবার পরেও একজন বাঙালি মুসলিম রমণীর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষে স্থির থাকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমাদের বাল্য ও কৈশর বার্ষিক শিশুসাথী বা দেব সাহিত্য কুটীরের বার্ষিকীতে তাঁর রচনা কখনো সখনো পড়েছি। পড়েছি কোনো ঝোনো স্কুল বইতে। দেশ ভাগের পর যেন স্মৃতিতেও এ বাংলায় হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মনে পড়ছে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের কালে ডঃ আনিসুজ্জামানের মুখে শুনেছিলাম বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে ত্রিপুরায় মুক্তি বাহিনীর এক ফিল্ড হাসপাতালে সেবিকা ও পরিচর্যাপরায়ণা হয়ে কাজ করছেন। ক্রমে জানতে পারি শওকত ওসমান ও রণেশ দাশগুপ্তের কাছে বেগম সুফিয়া কামালের বাংলাদেশের উদ্ভবের সক্রিয় ভূমিকার কথা, সেই ১৯৪৮ সাল থেকে।

১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তাণ গণপরিষদে, পাকিস্তান সংবিধান রচনা সভায় কুমিল্লার কংগ্রেস প্রতিনিধি সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে ইংরাজি ও উর্দুর পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে দাবি করেছিলেন। শুরু হলো বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন। এই আন্দোলনে সুফিয়া কামাল প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন।। ছিলেন রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনেও। সুফিয়া কামাল তাঁর একটি স্মৃতি কথায় লিখেছেন "ময়মনসিংহ থেকে যখন ধীরেন দত্ত সহ অনেক রাজবন্দী ছাড়া পেলেন, ধীরেন দত্ত তখন আমাদের বাড়ি এসে বললেন ...যে দিন শুনলাম মেয়েরা জেলগেট পর্যন্ত গিয়েছে সে দিন আমরা ভাবলাম আমাদের মুক্তি আসবে। সেই ধীরেন দত্ত নাই, বঙ্গবন্ধুও নাই - যারা আমাকে আদর করে দিদি বলে ডাকতেন।" এই কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে, সুফিয়া কামাল ভাষা আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতির প্রথম সারির মহিলানেত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সংস্কৃতি কর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ছিল। আমৃত্যু তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বিশেষভাবে নারী কল্যানের পক্ষে অসমসাহসিকা নেত্রী ছিলেন। কিছু বক্তিগত স্মৃতিচারণা করি।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহে ভারত - বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একাধিক সভায় বক্তা হিসাবে যোগ দিতে যাই। ঐ সময় ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন সম্ভবত প্রখ্যাত কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মী আভায় রায় বা

সুনীল মুখোপাধ্যায়। ছোটখাটি এক বৃদ্ধা। খুব নীচু গলায় কথা বলেন। সর্বতো ভদ্র আচরণ। কথায় পূর্ববঙ্গের প্রায় কোনও টানই নেই। দ্বিতীয়বার দেখা ১৯৭৪ সালে। ঢাকা বাংলা একাডেমিতে নজরুলের ওপরে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। সভাপতি ছিলেন কবির চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহম্মেদের জামাতা কবি ও নজরুল বিশেষজ্ঞ আব্দুল কাদির, কমরেড মনি সিং, খোকা রায়, যুঁইফুল রায় সহ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, ঢাকার নানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ছিলেন বেগম সুফিয়া কামালও। সভার শেষে তাঁর সঙ্গে নজরুল আবিষ্কার। সেই পরিচয় থেকেই সহজ সরল ভাষায় আবেগবহ শব্দ ও চিত্রকল্পে বিন্যস্ত হতে থাকে সুফিয়া কামালের কবিতা। কাজী নজরুল তাকে স্নেহ করতেন। রোকেয়া সাখাওয়াতের ব্যক্তিত্বমুগ্ধ সুফিয়া নিজেই ক্রমে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির সহসভানেত্রী। সমিতির পত্রিকা 'মৈত্রীর' সম্পাদিকা। ১৯৭৮ সালে ভারত - সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনে তিনি ও মহিলানেত্রী বেলা নবী এসেছিলেন। ঐ দুই মহিলা আমার পরিবারের সঙ্গে এক সপ্তাহের মতো কাল বাস করে গেছেন। আমার স্ত্রীর নাম শুনে প্রীত হয়ে হাসিমুখে তিনি ঠাট্টা করেছিলেন 'কেয়া কাঁটা' টি কেমন বলে। জানতে পারি তাঁর প্রথম জীবনে লেখা একটি ছোট গল্পের বই আছে। কেয়া কাঁটা। মাতৃসমা ঐ মহিলা আমার স্ত্রীকে নিজের মেয়ের মতো দেখতেন। আমর ছেলেমেয়েদের নাতি নাতনির মতো। ঐ সম্মেলনটি তাঁদের অভিজ্ঞতায় মধুর হয়নি। তাঁরা আমাদের সমিতির আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অবদান, বিশেষভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বড়ো যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার সাহসিকতা, এবং সঠিক ভাবে তাঁর ভারত - সোভিয়েত মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

১৯৮৯ সালে ঢাকায় যাই। তখন এরশাদের রাজত্ব। সুফিয়া কামালের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। এরশাদ ছিলেন কবিযশঃ প্রার্থী। তাঁর কবি সম্মেলন বাংলাদেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত কবিই বয়কট করেন, আমন্ত্রণ পেয়েও। স্বৈরশাসককে কবি মর্যাদা দেবার তাঁরা ছিলেন বিপক্ষে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা আমন্ত্রিত হন, তাঁদের বেশ কজন ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হন। শামসুর রহমান সব বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবিরা এতে খুবই কষ্ট পেয়ে ছিলেন। সুফিয়া কামালও। তিনি বললেন, "তোমাদের কলকাতার কবিরা বলেছেন বিদেশী এক রাষ্ট্রপতির ডাকে তাঁরা গেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির তাঁরা কেউ অংশভাগী নন। বেশ কথা। পাকিস্তানের এক রাষ্ট্রপতির অমানবিক আক্রমণের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের সব কবিই সোচ্চার হয়েছিলেন। ইয়াহিয়া করেছিল গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যা। এরশাদও তো গণতন্ত্র খতম করেছে। তার হাতেও বহু দেশপ্রেমিকের রক্ত লেগে আছে। কি জানি বাবা, তোমাদের চিন্তার ধরন ধারনটা কি। অন্নদাশঙ্কর বাংলাদেশের উদ্ভবের সময় কত সভাসমিতিই না সমর্থন করলেন। আবার মোরারজি যখন আশ্রয় চাওয়া মুক্তিসৈন্যদের ঠেলে পাঠাতে গেলেন, তিনি বললেন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে যা ঘটছে, তার বিরোধিতা করবেন কি করে? অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্র যদি বিদেশি কোনো ঘটনার বিরোধিতা করে তবে বিরোধী হব। নইলে নয়। বোধ হয়, ঠিক ঠাক বুদ্ধিজীবীর মতো, কবির

মতো মূল্যায়ণ নয় এসব।" তিনি পায়েস খাওয়ালেন। বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর বাড়িতে তখন ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কি এক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় টি. ভি. তে কাজ নিয়ে এসেছে পূর্ণেন্দু। তিনি বললেন, "সে তো হলে আমার কাছে উঠেছে কেন, তুমি বলবে সে এসেছে টেকনিকাল হেল্প্ করতে। এরশাদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে নয়। তা ছাড়া, কলকাতা থেকে যেকোনো কবি লেখক শিল্পীতো আমার বাড়িতে থাকতেই পারে, নিজ অধিকারে।"

১৯৯৪ সালে আমি সস্ত্রীক চট্টগ্রামে সূর্য সেন জন্ম শতবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত হয়ে যাই। চট্টগ্রামে তখন জামাত ইসলামের পোস্টার পড়েছে। 'সন্ত্রাসী ডাকাত সূর্য সেনের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান বয়কট করুন।' তখন বেগম খালেদা জিয়ার রাজত্ব। আমাদের জন্য চল্লিশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন চট্টগ্রামের আওয়ামি লিগ মেয়র। আমরাও ঘোষিত হয়ে গেলাম জামাতের প্রচারে, ভারতের গোয়েন্দা বলে। হোটেল ও সভা চত্বরের বাইরে নড়াচড়াই করা গেলনা প্রায়। ঢাকায় ফিরে একদিন সুফিয়া কামালের সঙ্গে যুগলে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর বাসায় উঠিনি বলে অনুযোগ করলেন। দেখলাম, ইতিমধ্যে বাড়িটি প্রায় খাঁচার রূপ নিয়েছে। বড় বড় লোহার গরাদ দিয়ে অনেকখানিই ঘেরা। কারণ মৌলবাদীদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য সুফিয়া কামাল। ঐ দুর্বলদেহ বৃদ্ধাকে এত ভয় পাবার কি আছে মৌলবাদীদের? আসলে মহিলা আন্দোলনেরও নেত্রী তিনি। একাধিক সংস্থা নিয়ে গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের তিনি সভানেত্রী। দেখলাম, ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহল বেশ বিভক্ত তসলিমা নাসরিন বিষয়ে। উনি বললেন, "দেখা করে এসো। তসলিমার সব মত আমি পছন্দ করছি না, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে ও জা বলতে চায় বলুক। সত্য হলে লোকে মানবে। নইলে ফেলে দেবে। ওতো ছেলে মানুষ, অপ্রপশ্চাৎ ভেবে কিছু বলতে শেখেনি। কোথায় জোর কদম ফেলতে হয়, কোথায় ধীর কদম, ও জানেনা। ওর কোন কথায় মৌলবাদীরা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে, অশিক্ষিত লোক জনকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিশীলদের হেনস্তা করতে পারে, এসব ওর ধারণাতেই নেই।"

বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে শেষবার দেখা হয় ১৯৯৬ সালে ঢাকায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উৎসব ও শহীদ প্রফুল্ল চাকীর ১০৮ তম জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা ও বগুড়ায় যাই। দেখলাম, সুফিয়া কামাল বার্ধক্যের ভারে একটু নুয়েছেন যদিও, মাথা তাঁর বেশ সজীব তখনও। চুলটুল তেমন পাকেনি। এবার আর রাজনীতিটিতি নিয়ে কোনো কথা নয়। শুধু বললেন, "তোমার বন্ধুদের বলো হাসিনার সরকার চলে গেলে আবার জঙ্গলের রাজত্ব ফিরে আসবে। ঐ যে তোমরা বলতে বামদের সঙ্গে গণতান্ত্রিকের জোট বাঁধতে হয়—সেই কথা আর কী। তবে কি জানো, বাংলাদেশের উদ্ভবের জন্য এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল, তরুণ প্রজন্ম তা জানেই না। ভুলভাল শেখানো হচ্ছে। ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানই নেই কারো। কমিউনিস্টদেরতো আবার নানা 'শেড'। এখন জানতো, মূল বিতর্কের বিষয় আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী। কে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে, না তিনুঘাটে জিয়া।"

বেগম সুফিয়া কামাল শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের মর্মবস্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চার ভিত্তি : ১) জাতীয়তাবাদ ২) ধর্মনিরপেক্ষতা ৩) গণতন্ত্র ও ৪) সমাজতন্ত্র—এর পক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। নারীমুক্তি ও নারীকল্যাণ ঐ সংগ্রামেরই অঙ্গ। 'আতক দালাল নির্মূল কমিটির' নেত্রীও হন তিনি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর। গত বছর ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধের

বিজয়োৎসবে মেয়েদের যোগ দেবার ব্যাপারে নিষেধ জানিয়ে জামাত এবং স্থানীয় মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকেরা ফতোয়া দেয়। এমন কী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষিত সম্মেলন স্থানের অনুমোদন বাতিল করে দেন। কত স্থানীয় কলেজ ক্যাম্পাসে ঐ অনুষ্ঠানের উপর আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে হামলা চলে। বহু আক্রান্ত শিশু ও নারী পেট্রল বোমায় দগ্ধ হয়। সুফিয়া কামাল সহ মহিলা নেত্রীরা এই আক্রমনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান। গ্রামে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা নিতে আগ্রহী তরুণীদের উপর আক্রমণ চলেছে। অ-সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিতে নিযুক্ত মেয়েরাও নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা খাপা কুকুরের মতো হয়ে পড়েছে। যেন তেন ভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করাটাই লক্ষ্য। সুফিয়া কামাল এই সামন্তবাদী, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং এদের প্রশ্রয়দাতা সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে সব সময়ই সাবধান করেছেন। চীন এবং তৎকালীন সোভিয়েত দেশেও তিনি ভ্রমন করেছিলেন।

বেগম সুফিয়া কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ঃ

জন্ম ঃ বরিশাল জেলার সায়েস্তাবাদ পরগণা। ১৯১১-এ ২৫ জানুয়ারি মাতামহ নওয়াব মুয়াজ্জেম হুসেন চৌধুরীর গৃহে। বাবা নোয়াখালি জেলার সৈয়াদ আব্দুল বারী। বি-এল। তিনি ইংরাজী, উর্দু, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, গুজরাটি, পালি, বাংলা প্রভৃতি আটটি ভাষা জানতেন। শিক্ষিত পরিবারে জন্মেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি সুফিয়া। তবে মামার বাড়িতে সাহিত্য পাঠের চর্চা ছিল। ছন্দের কারুকার্য তখনই তাঁকে নাড়া দেয়। পরিবারে বাংলা নয়, উর্দুতে কথা বলা হতো। বারো বছর বয়সে ১৯২০ সালে মামাতো ভাই নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয়। নেহাল হোসেন তাঁকে সাহিত্য সহায়তা দেন, এবং বাংলাভাষার নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। ১৯৩২ সালে আর্থিকভাবে ক্লিষ্ট সুফিয়া মা ও মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় বাস করতে আসেন এবং কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নেন। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ঐ স্কুলেই তিনি পড়িয়েছেন। ১৯৪৯ সালে প্রাবন্ধিক কামালউদ্দীন খানের সঙ্গে তাঁর পুনরায় বিবাহ নহয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় প্রকাশিত প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক 'সুলতানা' ও 'দিলরুবা' পত্রিকার সম্পাদিকা হন, দীর্ঘকাল 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি'র সভানেত্রী ছিলেন। প্রগতিশীল চিন্তা, শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। প্রেম প্রকৃতি, বেদনা-বিষাদ-বিরহ তাঁর কবি প্রতিভাকে স্ফূর্ত করেছে। বই 'সাঁঝের মায়া' (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১, সম ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), দীওয়ান (১৯৬৬), প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২), মুক্তিকার গান, অভিযাত্রিক। গল্প গ্রন্থ : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৮)। তাঁর এক পূর্ণবয়স্ক পুত্র আততায়ীর হাতে নিহত হয়। বহু মৃত্যু ও বেদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও, তিনি তাঁর সামাজিক কাজ থেকে চ্যুত হন নি।

মৃত্যু নভেম্বর ১৯৯৯

১৯৯১ সালে তাঁর আশি বছর পূর্তিতে বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে তাঁর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৬২ সালে তিনি পেয়েছিলেন বাংলা একাডেমির পুরস্কার। পেয়েছেন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশের পদক'ও।

(সৌজন্য ঃ আজহার ইসলাম)

বেগম সুফিয়া কামালের দুটি কবিতা

২১শে ফেব্রুয়ারি

আশ্চর্য এমন দিন। মৃত্যুতে করে না কেহ শোক,
মৃত্যুরে করে না ভয়, শঙ্কাহীন, কিসের আলোক
উদ্ভাসিত ক'রে তোলে ক্লান্ত দেহ, মুখ, পদক্ষেপ
সংকল্পের দ্যুতি তার দৃঢ়তার প্রচার প্রলেপ
করছে ভাস্বর।
এরা যেন করেছে স্বাক্ষর
মৃত্যুর পরওয়ানা প'রে বাংলা ভাষার লিখি নাম
'আমার মায়েরে আমি মাটি থেকে বুকে মোর তুলিয়া নিলাম'
সালাম বরকত ছিল, আরও ছিল নাম নাহি জানা কতোজন
পিতার অস্তিম আশা, জননীর বুক-জোড়া ধন,
কাহারও জীবন সাথী, বোনদের একমাত্র ভাই
তারা আজ নাই।
নাই?—আছে, আছে.....
আকাশে বাতাসে আর হিয়ার একান্ত কাছে-কাছে।
তাই তো মিছিল চলে দৃঢ় দৃপ্ত পদে, কণ্ঠভরা
মৃত্যুর অমর গান, তাই দৃষ্টি তীব্র অগ্নিক্ষরা।
মাতা-বধূ-ভগ্নিদের সব মুখ সংকল্প-কঠিন
এমন আশ্চর্য এই দিন।
অমর একুশে
অক্ষয় হয়েছে—বাংলা ভাষা রক্তে মিশে।

মেহেরুণনেসা

কুমারী কিশোরী শাহানার রঙে মেহেদি লাগেনি হাতে
জালিম কাফের পিশাচেরা সেই হাতে
অসহায়া মেয়ে মোর।
শানিত ছুরিকা হানিয়া কণ্ঠে তোর
তান্ডবলীলা শুরু করেছিল, রক্ত বসনা তুই
পূত পবিত্র এক মুঠি ফুল; শেফালী চামেলী জুই।
ভালবেসেছিলি এই ধরণীরে, ভালবেসেছিলি দেশ
তাই বুঝি তোর কুমারী তনুতে জড়ায়ে রক্ত বেশ
প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে
দুটি ভাই আর মায়ের তপ্ত বক্ষ রক্তে নেয়ে
দেশের মাটির'পরে
গান গাওয়া পাখি, নীড়হারা হয়ে
লুটালি প্রবল ঝড়ে।
ঝড় থেমে গেছে বাংলাদেশের কেটেছে অন্ধকার
সোনাঝরা এই রোদের আলোকে তুই ফিরিবি না আর।

সংস্কৃতি সংবাদ

সম্প্রতি বেশ কয়েকজন বাঙালি সংস্কৃতি পথিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় বিশিষ্ট ছিলেন। ডঃ অশোক মিত্র আই সি এস দীর্ঘকাল দিল্লীর উচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন ছিলেন। ১৯১৭ সালে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি অধ্যয়নের পর ব্রিটেনে শিক্ষা নিতে যান। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর বামপন্থী ঝোঁক ছিল এবং মার্কসবাদে ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। তাঁর খ্যাতি ১৯৫৯ সালের পর বিশেষ ভাবে আদমসুমারি রিপোর্ট ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে তিন খণ্ডে ১৯৫১ সালের আদম সুমারি রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি ও জাত পাত ১৯৩১- ১৯৫১, পশ্চিমবঙ্গে ভূমি ব্যবহার, ১৪ খণ্ডে ১৪টি জেলার আদম সুমারি হাতবই, পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা, ভারতের চিত্রকলা প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসেবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। চিত্রকলায় তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর বিশ্ব পরিচিতি ছিল। ভারতের নারীসমাজ নিয়েও নানা অর্থনৈতিক সন্দর্ভ তিনি লিখেছিলেন। ১৯৬১-৭১ সালে ভারতীয় নারীর জীবিকাভেদ এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে তাঁর রচনাটি সর্বজনস্বীকৃত। ভারতীয় নগর, সংস্থান, অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন ১৯৬৩ সালে। জনসংযোগ ও সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে নানা গবেষণার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিশেষ ভাবে আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তিনি ছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলার' সহযোগী গ্রন্থকার। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি সমর সেনের 'বাবুবৃত্তান্তের' অনুবাদ শুরু করেছিলেন। সঙ্গীতমনস্ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণ বক্তৃতায় ভারতীয় সমাজে জাতপাত ও শ্রেণী বিষয়ে যে বক্তৃতাটি দেন তা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন জাতপাত ও শ্রেণী বিষয়ে গান্ধিজী ও নেহরু যদি হিন্দু মুসলমান এবং নিপীড়িত শ্রেণী ও উপজাতিদের সমান ভাবে দেখতেন তাহলে মহম্মদ আলি জিন্নার পাল থেকে অনেকটা হাওয়াই বের করে নেওয়া যেত।

উত্তরবঙ্গের কালীগ্রাম থেকে রবীন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে এনেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের রবীন্দ্রঅনুরাগের কথা সর্বজনজ্ঞাত। তাঁরই পুত্র সাগরময় ঘোষ ও শান্তিদেব ঘোষ, এই দুজন বিশিষ্ট বাঙালি সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাগরময় ঘোষ ছিলেন ' দেশ ' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক। সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্য সম্প্রতি যে পথ নিয়েছে তাতে তাঁরও হাত ছিল। দেশ পত্রিকাটি যে হেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালির সাহিত্যমাধ্যম, ধরেই নেওয়া যায়, এই পত্রিকার সম্পাদক বিভিন্ন লেখককে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে সফল করে তুলতে চেয়েছেন। আধুনিক বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ যদি সত্যিই কোন গুরুত্বের অধিকারী হয়, সে গুরুত্বের পিছনে সাগরময় ঘোষের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তবে বাংলা ভাষার ছোট পত্রিকা গুলি বিকল্প প্রকাশকেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে একটি বিকল্প ধারাও বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠতে থাকে। আমরা তো মনে করি, ধরতে গেলে 'দেশ' ও প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলি এবং বিকল্প ছোট

তো মনে করি, ধরতে গেলে 'দেশ' ও প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলি এবং ছোট পত্রিকাগুলিতে জনপদে শত শত তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যে ভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির পরিপোষণ করছেন তাতে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য ধারার পাল্টা আরেকটি ধারাও গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সাগরময় ঘোষের ভূমিকাকে খর্ব করা যায় না।

শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন সাগরময় ঘোষের অগ্রজ। ১৯১০ সালে তাঁর জন্ম চাঁদপুরে। ছাত্র থেকে শুরু করে প্রাক্তন আশ্রমবাসী হিসেবে শান্তিনিকেতনে তাঁর জনসংযোগ ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তালিম পাওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সহকর্মী ও ঘরানার নিকট ব্যক্তি শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিপুল ভূমিকা পালন করেছেন। সংগীত ভবনে অধ্যাপনা করেছেন রীডার পরবর্তী কালে প্রধান ছিলেনঙ্গ সংগীত ভবনের দুবার অধ্যক্ষ হয়েছেলেনঙ্গ তাঁর গীত 'কৃষ্ণকলি' 'খাচার ছিল সোনার খাঁচাটিতে 'প্রভৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালি কখনো ভুলবেনা।

বাঙালি গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় শোনা যায় দীর্ঘ বিমর্ষতা রোগে ক্লান্ত হতে হতে আত্মঘাতী হন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ গায়কেরা তাঁর রচিত গান গেয়েছেন। আকাশে বাতাসে এখনো সে গান ভাসে। হাওড়ার শ্রীরাম ঢ্যাং রাস্তার অধিবাসী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতার আমল থেকেই চলচ্চিত্রের আপনজন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ গীতিকার রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের ধারায় অবশ্য তিনি গান লিখতেন না। কিন্তু অজয় ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মোহিনী চৌধুরী প্রভৃতির ধারাতেই তিনি গান লিখেছেন। তাঁর মান সংশয় জেগেছিল গীতিকাররা কবি কিনা, অথবা কবি না হলে গীতিকার হওয়া যায় কিনা। কেউ কেউ বলেন তাঁর লিরিকগুলি সম্প্রতি তেমন জনপ্রিয়তার না পাওয়ায় তিনি দোলাচলে থাকেই। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''আয় খুকু আয়'', 'যদি আকাশ হত আখি' ইত্যাদির জনপ্রিয়তা কোনদিনই হ্রাস পাবার নয়।

শ্রীমতী রঞ্জাবতী সরকারও নাকি বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইতে আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন। এই তরুণী নৃত্য শিল্পী সদ্য সদ্য ইউরোপ থেকে ফিরে বহু স্বপ্ন চোখে নিয়ে ভারতে ফিরেছিলেন। প্রথম বিবাদেই অসফল এই তরুণী নৃত্যশিল্পী বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছিলেন। বঙ্গ সরস্বতীকে যাঁরা বিশ্বে পরিচয় ঘটিয়েছেন রঞ্জাবতী তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর খ্যাতকীর্তি মা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। আমরা শ্রীযুক্তা চাকী সরকারকে সমবেদনা জানাই। আমাদের জানা প্রয়োজন, কেন পুলকবাবুর ও রঞ্জাবতীর মৃত্যু স্রষ্টাদের অসময়ে চলে যেতে হয়।

কবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৯৩২ এর ডিসেম্বরে। গত ১০ই ডিসেম্বর আকস্মাৎ হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি তাঁর সল্টলেক করুনাময়ীর ফ্ল্যাটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্মীয় মতের বিষয়ে শ্রদ্ধাভাবাপন্ন বাবার কাছে তিনি গতিলাভ এবং মধ্যপন্থা বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখেছেন। পরবর্তীকালে পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে কাজ করে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর অনূদিত 'কৃষ্ণ আফ্রিকায় কবিদের কবিতা কৃষ্ণকলি' অনেকের এখনো স্মরণে আছে। তাঁর 'বিষ্ণুবরেখা' কবি ছাড়া কয় বুঝা 'ইউকাডিপ্টাস' (কোবাবাটি) যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে। তিনি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া 'প্রতিদিন' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এ বছর পনায় অনুষ্ঠিত বেতিও কবি

হয়েছিলেন। তাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। শোনা যায় সরকারি তত্ত্বাবধানে ডিসেম্বর মাসের প্রথমে যে কবি সম্মেলন হচ্ছিল তার কিছু কিছু বিষয়ে মতামত পেশ করার জন্যই উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে জনৈক আধা তরুণ কবি তাঁকে আমন্ত্রণ করে বলেন। বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ঐ হঠাৎ বাম কবির বক্তব্যে আহত হন। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ভাবছিলেন, বণকৌশল যাই হোক, যে হেতু সব প্রগতিশীল কবিরই বণনীতি এক, অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, তাদের সবাইকে নিয়েই সরকারী আনুকূল্য এবং তত্ত্বাবধানের বাইরে একটি মিত্রকবিসম্প্রদায় গঠন করা। ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'আ'দপুরে তিনি এসেছিলেন। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর একটি কবিতা দেবার কথাও ছিল। তিনি বলছিলেন "জাহাজ যখন ডোবে ইঁদুরগুলি পালিয়ে যায়। আবার কেউ ফটো জাহাজে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্ফ করে। কেননা, পাশে আরেকটি বিকল্প জাহাজ রয়েছে। আমরা কিন্তু এই দু'রকমের ইঁদুরের কেউ নই। দেখি, যদি জাহাজটাকে বাঁচানো যায়। মানে বাম ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির জাহাজটাকে।" বলে তিনি হো হো করে হাসলেন - যা তাঁর স্বভাবজ ছিল। এই কবি প্রতীক ও মিথ ব্যবহার করে চিত্রকল্পের মহিমায় ও সুষমায় কবিতা লিখেছেন। তরুণ কবিদের কাছে তিনি শিক্ষকের মত ছিলেন।

জুলিয়াস সিজার নিজের নামে শুরু করেছিলেন এক বর্ষপঞ্জী - জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগে এই কালপঞ্জীর শুরু। খ্রিস্টিয় পোপ গ্রেগরী খ্রিস্টের জন্ম ২৫ শে ডিসেম্বর উদযাপন করেও এক বিশেষ বর্ষের হিসাব শুরু করেছিলেন ১লা জানুয়ারি থেকে। এত দিন পরে যখন দু - হাজার সালে পৌঁছচ্ছি, তখন প্রশ্ন উঠেছে ২০০০ সাল কি একুশ শতকের প্রথম বছর নাকি ২০০১ সাল?

কোন একক মাপতে শূন্য থেকেই শুরু করা হয়। কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা ব্যবস্থায় মাত্র দুটি সংখ্যাই আছে, ০ও ১, ফলে বছরের একক ধরা হয়েছে ০ বছর প্রথম। আরেক দল বলছেন বছরের শুরু বা প্রথমটা ০ সংখ্যা দিয়ে নয় ০ সেকেন্ড সংখ্যা দিয়ে। সে ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হবে ৩৬৫ দিন পুরো হলে। এমনি ভাবে একশো বছর পূর্ণ হয়ে একশোটা ৩৬৫ দিন হলো। সে বিচারে বিংশ শতাব্দীর শেষ বছর ২০০০ সাল। নতুন বছর শুরু হবে ২০০১ সালে।

২০০০ না ২০০১ এই সমস্যা সৃষ্টির আদি কারণ y2k কম্পিউটার কীট। আমরা যেমন তারিখ হিসেব করি সেই শতকের শেষ দুটি বছর দিয়ে, যেমন ৯০, ৯১, ৯৯ ইত্যাদি। কম্পিউটার এর তারিখ হিসেব করে চার অঙ্কের বছরের শেষ দুটি সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ০০ যখনই এসে পড়বে তখন সংখ্যা লিখন তালিকায় একদম সূত্রপাত পর্বে চলে যাবে। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া আছে, পিছনের সংখ্যা এলে বুঝতে হবে যন্ত্রটি খারাপ হয়েছে। এবার বন্ধ করে দাও। স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াতেই বন্ধ হয়ে যায় কম্পিউটার। ২০০০ সালে দুই শূন্য y2k - এই জন্য একে বলা হয়েছে কম্পিউটার কীট; যা কম্পিউটারকে বন্ধ করে দেবে। এজন্য ০০ বছরটিকে শেষ বলা হচ্ছে না; কম্পিউটার এর হিসাবে সূত্রপাত ধরতে হবে বলে ২০০০ সালকে শুরুর সাল হিসাবে প্রোগামিং করা হচ্ছে।

ইদে ব্রীটিশ ও মার্কিন দেশে কাল মান দন্ড নির্ধারণ সংস্থা ২০০১ সাল থেকে শতাব্দি

গুনতে শুরু করবে। বাঙালির তো হুজুগের শেষ নেই। কথায় বলে হুজুগে বাঙালি হুনুরে চীন। হঠাৎ শোনা গেল এই বছর উপলক্ষে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন মিলেনিয়াম অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য নাকি একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। শোনা গেছে বিদেশে প্রবাসী বাঙালিরা এ রাজ্যে আসবেন এবং বিস্তৃত সংগঠন গড়ে উঠবে। The main purpose of the Sammelan is to provide a broad forum for interaction between nonresident Bengalis and others who originated from Bengal and the people of West Bengal through cultural programmes, exhibitions and various other events. প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সভাপতি সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক সুজিত পোদ্দার। হয়ত এ রাজ্যে কারো কারো উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসী বাঙালিদের এ রাজ্যে ডেকে এনে পুঁজি লগ্নির প্লাবন ঘটিয়ে দেওয়া। ঐ যে রাজারহাট অঞ্চলে নগর পত্তন হচ্ছে, তাতে প্রবাসীদের নাকি এলাহি ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যা ঘটল বহুরাম্ভে লঘু ক্রিয়া বা পর্বতের মূষিক প্রসব।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের কোন ভাবে নাড়া দিল না এই সহস্রাব্দ উদযাপন। বরং দেখলাম অজিত পান্ডে, ক্যালকাটা ইউথ কয়ার, ভূপেন হাজারিকা, স্বপ্না চক্রবর্ত্তীর বহুশ্রুত গান। বয়সের ভার কণ্ঠের তারুণ্য সঞ্চয় রাখবে কি করে? জনপ্রিয় গানগুলি আজ তরুণদিনের হাস্যকর নকল মনে হল। মুম্বাই থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের উপস্থিতিও ছিল আকর্ষণ। যার মধ্যে অমিতাভ বচ্চনও ছিলেন। অমিতাভজীর বাঙালিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি এক বঙ্গ ললনার স্বামী! তারপর ছিল গুটি কয় চেনা নামের কবিদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের চেনা জানা পদ্য মকশোকারীদের হিং টিং ছট্ পাঠ। উদ্বোধন করেছিলেন উপরাষ্ট্রপতি শ্রীকৃষ্ণকান্ত; কিন্তু সে উদ্বোধনও ছিল পাড়ার ক্লাবের মতন। যাই হোক, ভালয় ভালয় সহস্রাব্দ বা মিলেনিয়াম উদযাপন মিটেছে। প্রসঙ্গত একই সময়ে নান্দীকার তার নাট্যমিলনমেলা চমৎকার ভাবে উদযাপন করেছে। একটি দিকে রাজ্যের প্রধানরা, বিদেশি ডলার দাতারা, অন্যদিকে কলকাতার নাট্যসংস্থা নান্দীকার। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে দিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

একটি ভারতীয় যাত্রী বিমান কাঠমাড় থেকে ছিনতাই হলো, অমৃতসরে নামল, তারপর দুবাই ঘুরে কান্দাহারে দিনের পর দিন তালিবানদের তত্ত্বাবধানে পড়ে রইল। একজন যাত্রী খুনও হলেন। শেষে ১লা জানুয়ারির উড়ানে ছিনতাই বিমানের যাত্রীরা দিল্লিতে ফিরল। ছিনতাইকারীরা দাবী করেছিল জনৈক সন্ত্রাসবাদীকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে হবে। পরে দাবী বাড়ল। সরকার দর কষাকষি করে রফা করল, শেষে একজনের জায়গায় তিনজনকে ছেড়ে দিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করা হলো।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, অমৃতসরের বিমানবন্দর থেকে বিমানটি কি ভাবে উড়বার সুযোগ পেল? কোন্ গড়িমসির ফলে ছিনতাইকারীরা দর কষাকষিতে লাভ করতে পারল? এ রকম কাণ্ড চললে দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি রক্ষা তো বটেই বৈদেশিক কাজকর্মে সন্দেহ এসে যায়। শুনছি কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিতো বটেই, সরকারী জোটের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছে প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যাটি যেমনভাবে ফয়সালা করেছেন তা নিয়ে। উপরন্তু বাজপেয়ী পাকিস্তানকে

সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। ব্রিটেন, আমেরিকা তা নাকচ করেছে। অর্থাৎ ভারতসরকার কার্যত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই নাকানি চোবানি খাচ্ছে।

গত নভেম্বরে উড়িষ্যার উপকূলে মহাসামুদ্রিক ঝড় বা সুপার সাইক্লোন ভেঙে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে গৃহচ্যুত ও পথের ভিখারী হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ভারতের নানা রাজ্যের মানুষ উদ্যোগী হয়ে ত্রাণ পাঠিয়েছে। তবে খোদ উড়িষ্যায় সরকারি দলের মধ্যে এই উপলক্ষ্যে কে ক্ষমতায় যাবে তা নিয়ে দর কষাকষি শুরু হয়েছে। পোখরান ও বেলুচিস্তানে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা, ঘাউরি ও পৃথ্বী উৎক্ষেপন ভূপৃষ্ঠকে তপ্ত করেছে। মাটির তলায় কাঁপন ধরিয়েছে। শুধু তো ঝড় না, কোথাও ভূমিকম্প বা কোথাও প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সীমান্ত দিয়ে দেশ ভাগ করে। প্রকৃতি কোন সীমানা মানে না। একটি বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে যে ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, মনে হয়, প্রকৃতির ভরসাম্য বিনষ্টের ফলে এমনটা হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে ও ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে যত লোক মারা গেছে, যুদ্ধে তত মারা যায় নি। নেভাডায় প্রথম পরমাণু বোমা ফাটাবার পর ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘটেছিল প্রবল বন্যা ও ভূলোচ্ছাস। হিরোসিমায় বোমা ফেলার পর চীনের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল শোনা যায়। কাজাকস্তানে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবার পর তাসখন্দে দারুণ ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। মানুষের তৈরি অস্ত্র ও নানা বিস্ফোরণ মানুষেরই জীবন বিপন্ন করে তুলছে এই গ্রহে। তাই সাধু সাবধান!

স. অ.

With Best Compliments From :

A Well Wisher

(New Delhi)

অ-কে-

আন্তরিক শুভেচ্ছায়

জনৈক সহযোদ্ধা

. 34415 / 82

December
February 2

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

অ

পড়ুন

অ

পড়ান

প্রকাশক : স্কাড

স্কাডের আরো উদ্যোগ

কাহিনীচিত্র — অনু, আততায়ী

দূরদর্শন ধারাবাহিক — জীবন বড় বেগবান

ছোটদের জন্য গানের ক্যাসেট — টুপ টাপ বৃষ্টি

'অ' সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশক 'স্কাড'
এ ২৩ নেতাজী সমবায় আবাস, প্রফুল্ল কানন, কলকাতা - ৫৯ কর্তৃক
'সোনার বাংলা' প্রেস - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৫৯ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : শমীন্দ্র ভৌমিক

বিনিময় : পনের টাকা